প্রথম প্রকাশ

মহালয়া ১৩৬৭ । অক্টোবর ১৯৬০

প্রকাশক

শীলা ভট্টাচার্য

আশা প্রকাশনী

৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর

রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিউ টাইমস্ প্রিণ্টার্স

২০৬, বিধান সরণী

কলকাতা ৭০০০ ০৬

প্রচ্ছদ

অজয় গুপ্ত

মা এবং বাবার
স্মৃতির উদ্দেশে

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

বিষ্ণু দে-র কবিতা এবং সেই সূত্রে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসু কোনো এক লেখককর্মীর হাতে হঠাৎই এসে পড়ল বিষ্ণু দে-কে লেখা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র একতাড়া চিঠি। সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র অনুভূতির গভীরতা তার আগেই জানা ছিল—এরকম আকৈশোর অনুরক্ত বন্ধুস্মৃতি আর কোথায়! জানা ছিল উভয়ের মতৈক্য ও মতান্তরের নানা বিক্ষিপ্ত ঘটনাও। কিন্তু চিঠিগুলোতেই যেন প্রথম প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল উভয়ের বন্ধুত্বের পতনঅভ্যুদয়ে বন্ধুর নাটকীয়তা। এই নাটককে উন্মোচিত করাই বর্তমান গ্রন্থের লক্ষ্য।

দুই কবির বন্ধুত্বের ইতিহাসই তো যথেষ্ট উদ্দীপনার বিষয়। তার উপর সেই দুই কবি যদি হন আধুনিক বাংলা কবিতার দুই শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, তবে তাঁদের বন্ধুত্বের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত ঐ যুগের কবিতার ইতিহাসও। ফলে এই ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায় কবিতা বিষয়ে নানা প্রস্তাব, নানা তর্কবিতর্ক, নানা সমস্যার বিবরণও। সম্পর্কটা মৈত্রীর যেমন, তেমনি মতান্তর বা হয়তো কিছুটা মনান্তরেরও বটে। দুই স্বতন্ত্র নন্দনদৃষ্টির সাক্ষাৎকার—তাদের যাত্রাবিন্দুর ঐক্য ও পরিণামী বিচ্ছেদ।

এই চিঠিগুলো ভূমিকা ও টীকা সহ 'পরিচয়' মাসিকপত্রে বেরোবার পর আজ যখন সম্পূর্ণ নতুনভাবে, আদ্যোপান্ত সংযোজিত হয়ে পাঠকদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে, তখন বলে নেওয়া ভালো, লেখক যদিও উভয় কবিরই কাব্যজিজ্ঞাসা ও কাব্যানুশীলনের গুরুত্ব বিষয়ে সমান সচেতন, তবু শেষপর্যন্ত তার পছন্দ-অপছন্দ বা দৃষ্টিভঙ্গি এই সম্পাদনা ও আনুষঙ্গিক রচনাতে নিশ্চয়ই গোপন থাকে নি—বস্তুত গোপন রাখার চেষ্টাও হয় নি।

যেহেতু চিঠিগুলোকে আবর্তন করেই এই বন্ধুত্বের ইতিহাস রচনা করা হয়েছে, তাই চিঠিগুলোর ব্যাখ্যা ও অনুষঙ্গের বাইরে সঞ্চরণের স্বাধীনতা ছিল সীমাবদ্ধ। তবু প্রায়শই সে-সীমা লঙ্ঘন করা হয়েছেও বটে। তা ছাড়া বিষ্ণু

দে-র লেখা চিঠিগুলো পাওয়া সম্ভব হলে এই মানস-ইতিহাস যতদূর উন্মোচিত হতে পারত, তা নিছক অনুমানে বা তথ্যানুসন্ধানে তো সম্ভব নয়। তবু সৌভাগ্য, আমার অনুরোধে শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী প্রণতি দে দীর্ঘ দিন ধরে আমার অজস্র প্রশ্নের উত্তর মুখে-মুখে ও লিখিতভাবে দিয়েছেন বলেই কিছুটা অভাব পূরণের চেষ্টা করা গেছে। তা ছাড়া আমার পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল, এই সূত্রে যদি দুই কবির জীবনীগত উপাদানও কিছু কিছু জানা হয়ে যায়, তাতে পরবর্তীকালে পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার কাজেও তো সাহায্য হতে পারে।

দুই কবির নান্দনিক উপলব্ধির এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশের মিল-অমিল প্রাসঙ্গিকভাবে যতটুকু এসেছে, তা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ নয় এবং পরিশিষ্টের ছোট পরিসরে সেই ইঙ্গিতকে আরেকটু প্রসারিত করার চেষ্টা হয়েছে বটে, কিন্তু এ-কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় কখনোই যে, এই গ্রন্থের মূল বিষয় দুই কবির বন্ধুত্ব।

গ্রন্থে অনুসৃত মুদ্রণনীতি সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা দরকার। যে সব লেখা থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে বা সাক্ষ্য মানা হয়েছে, তাদের বিবরণ যথোচিত ভাবে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিষ্ণু দে ও প্রণতি দে-র চিঠি (৮.১২.৭৬ এবং ১৩.৬.৭৭ এর মধ্যে লিখিত) থেকে বাক্য বা বাক্যাংশ উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে বটে, কিন্তু কোনো সূত্র নির্দেশ করা হয় নি। অর্থাৎ সূত্রনির্দেশহীন উদ্ধৃতিকে সাধারণভাবে ওঁদের প্রশ্নোত্তর বুঝতে হবে।

চিঠিগুলো অবিকল ছাপা হয়েছে—কলমপিছল ভুল সমেত। তৃতীয় বন্ধনীর ([ ]) মধ্যে ভুল সংশোধন করা হয়েছে কিংবা মূল পাঠের বাইরের অংশ লেখক কর্তৃক সংযোজিত হয়েছে। চিঠির তথ্যমূলক টীকা চিঠির নীচে বর্জাইসে এবং আনুষঙ্গিক আলোচনা পরে 'চিঠি প্রসঙ্গে' অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, 'চিঠি প্রসঙ্গে'-র ১, ২, ৩ সংখ্যাগুলি চিঠির সংখ্যা নির্দেশ করছে।

ইচ্ছে ছিল গ্রন্থের শেষে একটি বিষয়-নির্দেশিকা দেওয়া, কিন্তু তৈরি করেও স্থানাভাবে দেওয়া গেল না। 'দুই বন্ধু, দুই কবি' অংশটির শুধু বিশ্লেষিত সূচি

দিয়ে আমি আভাস দেওয়ার চেষ্টা করেছি গ্রন্থের বিষয়বস্তুর এবং ঐ বিষয়গুলিই আরো বিস্তারিত ও অনুষঙ্গসমৃদ্ধ হয়ে আছে গ্রন্থের অন্যান্য অংশেও। বইটি এক সঙ্গে রচিত হওয়ার চেয়েও ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে বলা চলে। তার ফলে কখনো কখনো একই প্রসঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন ঝোঁকে ও দৈর্ঘ্যে বর্ণিত হয়ে থাকতে পারে। সব মিলিয়ে একটা ছবি ফুটে উঠলেই আপাতত সার্থকতা।

এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে প্রথমেই আমার বন্ধু শ্রীদেবেশ রায়ের কথা বলতেই হয়। ওঁর সাহায্য পেয়েছি বললে খুব কম বলা হয়—বস্তুত আলোচ্য গ্রন্থের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে লেখার প্রত্যেকটি স্তরে আছে দেবেশের পরামর্শ, উপদেশ, অনুপ্রেরণা। অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি যেভাবে আমার কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, তা আমার কাছে অবিস্মরণীয়। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, এই গ্রন্থের মতামতের বা ত্রুটিবিচ্যুতির দায়িত্বও তাঁর উপর বর্তাচ্ছে।

বই বা তথ্য জুগিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রীঅরুণাভ দাশগুপ্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শ্রীহেমোপম দস্তিদার, শ্রীসুবীর ভট্টাচার্য ও শ্রীরমাপ্রসাদ দত্ত। নানা সময়ে মতামত জানিয়ে উপকৃত করেছেন শ্রীযুক্ত চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আশীষ বর্মন ও শ্রীমতী কেতকী কুশারী ডাইসন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত আদিত্য ওহদেদার অনুমতি দিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথের পুস্তকসংগ্রহটি ঘেঁটে দেখার। সুধীন্দ্রনাথের চিঠিগুলো মুদ্রণের লিখিত অনুমতি পাওয়া গেছে শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রনাথ দত্ত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে-র কাছ থেকে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে-র ছবি দুটোই সদ্যপ্রয়াত কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের তোলা। সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পরে লেখা বিষ্ণু দে-র কবিতাটি ব্যবহার করে শ্রীঅজয় গুপ্ত যে প্রচ্ছদপটটি তৈরি করেছেন, তার জন্যও আমি কৃতজ্ঞ। বাহুল্য হলেও আন্তরিক ধন্যবাদ সাহসী প্রকাশক শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য-কে।

অরুণ সেন

দুই বন্ধু, দুই কবি

হাতিবাগান থেকে কলেজ স্কোয়ার তো সামান্য পথ। এই শতকের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকের কথা। তখনকার ঐ কায়স্থদের উত্তর কলকাতায় দুটি বনেদি পরিবার দুটি বড় বাড়িতে—হাতিবাগানে সুপ্রাচীন দত্ত পরিবারের ছেলে হীরেন্দ্রনাথের বাড়ি এবং কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে শ্যামাচরণ দে-বিশ্বাস পরিবারের বাড়ি। এই দুই পরিবারের মধ্যে একটু দূর বৈবাহিক সম্বন্ধও ছিল।[১] সূত্র কলকাতারই আরেকটি সুবিখ্যাত কায়স্থ পরিবার—পটলডাঙ্গার বসুমল্লিক-বাড়ি। ঐ বসুমল্লিকদের বাড়িরই একটি মেয়ের বিয়ে হয় শ্যামাচরণ দে-বিশ্বাসদের পরিবারে। ফলে সুধীন্দ্রনাথ, তখন তরুণ বা নব্য যুবক, তো আসতেই পারেন, অন্তত মামাদের সঙ্গে, মামাতো দিদির শ্বশুরবাড়ি।

সুধীন্দ্রনাথের তখনই খুব নামডাক ও পরিচিতি—উজ্জ্বল দেদীপ্যমান তরুণ হিসেবে—অন্তত কলকাতার বিস্তৃত কায়স্থসমাজে—আর "কলকাতার খুব কম কায়স্থ বংশ ছিল যাঁরা দত্ত বংশের সঙ্গে আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন না।"[২] পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-ও তো ছিলেন আশ্চর্য ব্যতিক্রম তাঁদের পরিবারে, বিদ্যায় এবং নীতিজ্ঞানে। ফলে হীরেন্দ্র দত্ত-র বুদ্ধিদীপ্ত সুপুরুষ এই ছেলেটিকে নিয়ে উত্তর কলকাতার কায়স্থ সমাজে নিশ্চয়ই আলোচনার ঢেউ উঠেছিল।

বিরাট যৌথ দে-বিশ্বাস পরিবারের এক উৎসুক বালক বিষ্ণু দে যখন তাঁর চেয়ে বছর আটেকের বড়, পরিবারে বহু-নন্দিত এই সুধীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখলেন, তখন তাঁর চোখে কিরকম বিস্ময় ফুটে উঠেছিল, তাও আন্দাজ করতে পারি। আজও বিষ্ণু দে স্মরণ করতে পারেন সেই প্রথম দেখাটা। "সুধীন্দ্রনাথ দেখতে খুব সুশ্রী ও 'বাবু', কখনও-বা শাহেব সেজে মামার সঙ্গে (নীরদ বা অনি মল্লিক) আসতেন। কলেজ স্কোয়ারে।" মামা আসতেন খালি গায়ে সেকালের দুর্লভ মোটরকারে চড়ে এবং পাশে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-র কেতাদুরস্ত রূপবান ছেলে সুধীন্দ্রনাথ।

এ তো হল প্রথম দর্শন। প্রথম ব্যক্তিগত পরিচয় আরো পরে। কিভাবে আলাপ হল এই স্বভাবলাজুক কিশোরের সঙ্গে সদ্যবিবাহিত, যৌবনের আত্মপ্রত্যয়ে দীপ্ত জ্যেষ্ঠের? এই পরিচয় সম্ভব হল অবশ্য সুধীন্দ্রনাথের প্রথমা স্ত্রী ছবির সঙ্গে বিষ্ণু দে-র মামার বাড়ির সম্পর্কে আত্মীয়তার সূত্রে। সুধীন্দ্রনাথের তখন জোর ফটোগ্রাফির শখ, নিজেই ডেভলপ্‌ করেন। ছবির নানা ভঙ্গির ফটো শুকোবার জন্য সারা ঘরে দড়িতে টানাচ্ছেন ক্লিপ দিয়ে—স্মৃতি হাতড়ে এটুকুই শুধু মনে করতে পারেন বিষ্ণু দে। অনেক দিন পরে একদিন বন্ধুকে এই গল্প করেছিলেন তিনি—সুধীন্দ্রনাথ স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকে ভ্রূ কুঁচকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন এই বলে, আপনি কি করে জানবেন, আপনি তো তখন খুবই বাচ্চা!

বিষ্ণু দে-র আর কিছু বিশেষ মনে নেই। সুধীন্দ্রনাথেরও নিশ্চয় কিছু মনে ছিল না, তাই দীর্ঘ দিন পরে পত্রের মাধ্যমে দ্বিতীয়বারের আলাপ শুরু হতেই লিখলেন, "আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্যক।" বিষ্ণু দে জানাচ্ছেন, "সুধীন্দ্রনাথের মনে ছিল না, দেখা হবার পর আবার মনে পড়ল।" পারিবারিক আত্মীয়তা নয়—এবারের আলাপের সূত্র একজন ইংরেজ কবি—তাঁর নাম টি এস এলিঅট।

প্রায় স্কুলজীবনের প্রান্তে বা কলেজজীবনের সূচনায়, বাল্যেই পরিণত জিজ্ঞাসার তাড়নায়, বিষ্ণু দে হঠাৎ খুঁজে পান টি এস এলিঅটের বই। বলেছেন এইভাবে, "তারপরে এল আকস্মিকভাবে আমাদের পটলডাঙা পাড়ার পুরোনো বই-এর কারবারী ইউসুফ-এর দাক্ষিণ্যে এলিঅটের 'দি সেকরেড উড' আর 'পোয়েমস ১৯২৫'। পুরোনো কিন্তু শস্তা—টাকা টাকা। কিন্তু প্রায় আনকোরা অবস্থায়। এলিঅট সাহেবের নামটা আগেই জানতুম, কবিতা পড়েছিও গোটা কয় মার্কিন কবিতার সংকলনে।...তখনও তাঁর বিখ্যাত পত্রিকা 'দি ক্রাইটেরিঅন' চোখে দেখিনি।"[৩] চিঠিতে জানাচ্ছেন, "হঠাৎ কিনতে পাই ও পড়ে মুগ্ধ হই।" কল্পনা করে নিতে পারি, এলিঅট-পাঠের উত্তেজনায় এই পরিণতরুচি বালক খুঁজে বেড়াচ্ছেন আর কোনো সমধর্মী পাঠক, এলিঅট যাঁর চেনা আছে—এলিঅট নিয়ে যাঁর সঙ্গে দু-দণ্ড কথা বলা যায়।

পৌঁছে যায় সুধীন্দ্রনাথের এলিঅট-ভক্তি বা অনুরাগের খবর। "অচিরে সামাজিক সম্পর্কের সুযোগে জানতে পারলুম যে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মশায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র সুধীন্দ্রনাথ এই কবির ও সমালোচকের মুগ্ধ পাঠক।"[৪] সুধীন্দ্রনাথও ক্রমে জানতে পারেন বিষ্ণু দে-র এই মুগ্ধ উত্তেজনা। ঠিক কিভাবে জানি না —বিষ্ণু দে শুধু বলেন, "এলিঅট অনুরাগ তাঁকে জানাতেই হয়, কারণ Faber & Gwyer (পরে & Faber) এর Criterion পত্রিকা বেরোয়: সম্পাদক T. S. Eliot।" অর্থাৎ ক্রাইটেরিঅন পত্রিকার সঙ্গেও ইতিমধ্যে তাঁর পরিচয় ঘটেছে। অতএব, "কৌতূহল থেকে হল, বলা যায়, এলিঅট পাঠের নন্দিত উত্তেজনা থেকে হল সামাজিক সম্বন্ধোত্তর সাহিত্যিক সৌহার্দ্য।"[৫]

সৌহার্দ্যের এই সহজ মসৃণ গড়িয়ে-যাওয়া চলন বুঝতে হলে তখনকার কলকাতার একটা ছবি ভেসে ওঠা চাই মনের মধ্যে।[৬] আজকের অতি-ব্যস্ত পরিচয়লোপী নির্বিকার মেট্রোপলিস নয়—কলকাতার ছিল একটা লপেটা চাল, কোরাস কিন্তু ধীরছন্দ, বেসুরো উন্মত্ততা নয়—বিষ্ণু দে যে কথা বলেছেন, বাসের দোতলার খোলা ছাদে হাওয়া খেতে-খেতে বেড়ানো যেত কিংবা পায়ে হেঁটে চলাটাই স্বাভাবিক ছিল আড্ডায় বা আত্মীয়-বন্ধুর বাড়িতে যেতে। বুদ্ধদেব বসু তো ঢাকা থেকে কলকাতায় এসে তারই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন যৌবনে, বলেছিলেন, কলকাতা "হাজার হাতে আমাকে টেনে নিচ্ছে নিজের মধ্যে।"[৭] পাড়ায় পাড়ায় ছিল স্বাতন্ত্র্য, বিষ্ণু দে-র ভাষায় "আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য"—হয়তো সুধীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন বিচ্ছিন্নতা এবং খণ্ডতা, কোটারি, কিন্তু তা সত্ত্বেও কলকাতাতেই তো বিরাজ করতে পারে, সুধীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন, সেই সজীব মানস, যার মধ্যে থাকে অন্তহীন কৌতূহল। এই পরিবেশেই এলিঅট মিলিয়ে দিতে পারে দুই পাড়ার দুই অনুরাগী পাঠককে।

সুধীন্দ্রনাথ তো বটেই, বিষ্ণু দে-ও ইতিমধ্যেই কবিতা লিখতে শুরু করেছেন। সুধীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য 'তন্বী' গ্রন্থের সবচেয়ে পুরোনো কবিতা অক্টোবর ১৯২৪-এ এবং বিষ্ণু দে-রও কৈশোরক যুগের পরে কবিতা লেখা শুরু ১৯২৫ থেকে। রবীন্দ্রনাথের পরে, নতুন কবিতা লেখার তাড়নায়, যে

নতুন নন্দনের প্রয়োজন হল তাঁদের, তাই জোগালো এলিঅটের কবিতা ও প্রবন্ধ। ব্যাপারটা শুধু নতুনত্বের তাগিদই নয়, সামাজিক-ঐতিহাসিক পর্বান্তরই দাবি করেছিল, নতুন নন্দনদৃষ্টি—এলিঅটের রচনাতেই তার ক্ষুধা মিটল—অন্তত ওঁদের দুজনের কাছে। ফলে এলিঅটকে কেন্দ্র করে শুধু তাঁদের "সাহিত্যিক সৌহার্দ্য" নয়, শুরু হল দুজনের সমধর্মী কাব্যাদর্শের ভূমিতে স্বতন্ত্র কাব্য-অভিযান। একেই বিষ্ণু দে বলেছেন এলিঅটের প্রবন্ধের "আলোকিত ধাক্কা" এবং তাঁর কবিতার "ভয়ঙ্কর লিরিক্‌ল্‌ শক্তি"-র ঘোর—যা "পাশ্চাত্যের অনেকের মতো আমাদেরও কাউকে কাউকে বেশ অনুপ্রাণিত করে।"৮ বলা বাহুল্য, "আমাদের কাউকে কাউকে" বলতে তিনি নিজেকে এবং সত্যলব্ধ বন্ধু সুধীন্দ্রনাথকেই বুঝিয়েছেন প্রধানত।

কিন্তু তখনও পত্রের মাধ্যমেই আলাপ চলছে—এবারের সাক্ষাৎ ঘটে নি। এলিঅটের মধ্যস্থতায় উভয়ের সাহিত্য-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা-বিনিময়ও শুরু হয়েছে। সাক্ষাৎ ঘটে নি, তবু "Eliot-সম্বন্ধে একটা সারগর্ভ প্রবন্ধ" লেখার জন্য সুধীন্দ্রনাথকে চিঠিতে অনুরোধ করছেন বিষ্ণু দে (১ম চিঠি, ১৯২৮)। এই সময়ের আর কোনো চিঠি আমরা পাই না—কিন্তু তাগাদা করে করে স্বভাব-সঙ্কুচিত সুধীন্দ্রনাথকে শেষপর্যন্ত অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন তিনি। সুধীন্দ্রনাথ যে-প্রবন্ধটি শেষপর্যন্ত লিখলেন, তার বিষয় অবশ্য নিছক এলিঅট নয়, সামগ্রিকভাবে এলিঅট-অনুপ্রাণিত নতুন কাব্যনন্দনের সপক্ষে একটা জোরালো যুক্তি। খুব খুশি বিষ্ণু দে। তাঁরই উদ্যোগে এই প্রবন্ধটি একটি ছোট্ট সাহিত্যসভায় পড়া হয়। পরে অবশ্য প্রবন্ধটির অনেক মাজাঘসা হয় এবং তখন থেকেই বন্ধুর এই নিরন্তর পরিমার্জনার অভ্যাস বা আদর্শ বিষ্ণু দে-কে মুগ্ধ করে। তিনি নিজেই ঐ ইতিহাসকে বলেছেন এই ভাবে: "১৯২৮-এ ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্যুটে পরে যার নাম ছাপা হল কাব্যের মুক্তি পাঠ করাতে রাজি করাই। অতুল গুপ্তকে সভাপতি করে ঘরোয়া বৈঠকে (তেতলার এক ঘরে সতরঞ্চিতে বসে) ৮।১০ জন নবযুবক শ্রোতা। 'কাব্যের মুক্তি'-র প্রথম প্রয়াস। পরে অনেক বদল করেন।"

বছর দু-তিনের ছেদ। বিষ্ণু দে লিখেছেন, "তারপরে বোধহয় কিছুকাল দেখা হয় নি।" তিনি অবশ্য তখন পুরোপুরিই সাহিত্যাক্রান্ত—বই পড়েছেন "এন্তার" (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-র ভাষায়), যদিচ ১৯২৮-এই যিনি এলিঅটের ভক্ত, ১৯২৯-এ তিনি আই. এ-তে ফেল করে বসলেন। আগে থেকেই তো তিনি সাহিত্যিক ও সাহিত্যের আড্ডা বিষয়ে উৎসুক, নিজে যদিও খুবই লাজুক। 'কল্লোল'-এর কারো কারো সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, বেশ ঘনিষ্ঠতা, কল্লোল-এর আড্ডায় যান, গল্পকবিতাও ছাপান। একই সঙ্গে কল্লোলগোষ্ঠীর বোহেমিয়ান মেজাজে আকৃষ্ট, আবার তাদের ছেলেমানুষিতে কৌতুকাবিষ্ট। সেণ্ট পল্স্ কলেজে বি. এ. পড়ার সময়ই একদিন, তাঁর কিছুদিনের গৃহশিক্ষক নীরেন্দ্রনাথ রায় নিয়ে গেলেন সুধীন্দ্রনাথের কাছে। কারণ: 'পরিচয়' নামে একটি পত্রিকা বেরোবে এবং তাতে লিখতে হবে। বিষ্ণু দে-র মনে আছে এই তৃতীয়বারের সাক্ষাতের দিনটির কথা। "নীরেন্দ্রনাথ রায়ই 'পরিচয়' প্রথম বেরোবার আগে ১৩৯ কর্ণোআলিস্ স্ট্রীট দোতলার বড় ঘরে নিয়ে যান। তখন সুধীন্দ্রনাথ হেলান দিয়ে ব'সে, খুব জ্বরে কাবু। ছবি (প্রথমা স্ত্রী) স্বামীর বিছানায় বসে থেকে থেকে বরফ-ব্যাগ মাথায় দিচ্ছেন। সুধীন্দ্র কবিতা দেখতে চাইলেন এবং খুশি হলেন। মনে আছে ছবিও বললেন: আমি কি দেখব? এবং দেখেছিলেন। ছবি আমার আত্মীয়া ছিলেন। কবিতা দুটি পরিচয়-এর প্রথম সংখ্যায় বেরোয় এবং প্রাস্তের অনুবাদটিও।"[৯]

সুধীন্দ্রনাথ বেশ আঁটঘাট বেঁধে, তোড়জোড় করে 'পরিচয়' নিয়ে নেমেছেন। ইতিপূর্বেই দত্তবাড়ির এই ভাগ্যবান ছেলেটি বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের গণ্ডী পার হয়ে হয়ে ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ, পিতার ইচ্ছে সত্ত্বেও অ্যাটর্নিশিপের পরীক্ষাতেও নিরুৎসাহ এবং রবীন্দ্রনাথের দুর্লভ সাহচর্যে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং একাকী ইওরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরে ঘুরে বেশ বিদগ্ধ। দেশে ফিরে এসে তিনি আবিষ্কার করলেন, সাহিত্যই তাঁর একমাত্র ব্রত। দেশবিদেশের সাহিত্যের পরিচয়ে তাঁর মনের দরজাও ইতিমধ্যে খুলে গেছে। কাব্যে এলিঅটের দীক্ষা তো ছিলই—তিনি চাইলেন বাংলা ভাষার ক্রাইটেরিঅন বের করতে। ভাই ও বন্ধু ভাগ্যও খুব ভালো। ফলে

ভাই হরীন্দ্রনাথ দত্ত ও "অত্যন্ত উদার পিতা" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-র আর্থিক সাহায্যে এবং নতুন ও পুরোনো অনেক বন্ধুর উৎসাহে ১৯৩১-এ 'পরিচয়' বেরোল। বন্ধুদের মধ্যে দুজনের কথা বিষ্ণু দে বলেন, "সত্যেন্দ্রনাথ [বসু] ও (সার্) ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র [সুধীন্দ্রনাথের] নিকটআত্মীয় ও সমবয়সী ছিলেন, দুইজনেরই ডাকনাম ছিল 'বদি'। এঁদের উৎসাহেই সুধীনবাবু পরিচয়-এর ব্যাপারে মাতেন।" একই সময়ে তাঁর পাশে ছিলেন আরো দুই পুরোনো বন্ধু—গিরিজাপতি ভট্টাচার্য ও নীরেন্দ্রনাথ রায়। 'পরিচয়'-এর প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার কি দায়ভাগ, তা নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে—তবে সেটা তত বেশি জরুরি নয়—আমরা হরীন্দ্রনাথ দত্ত-র সাক্ষ্য অনুসারে প্রথম দিকের অংশ-গ্রহণকারীদের নাম করে যেতে পারি কেবল : চারুচন্দ্র দত্ত, অপূর্ব চন্দ, ধূর্জটি-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, হিরণকুমার সান্যাল, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ বা সুশোভন সরকারের। এঁরা প্রত্যেকেই এসেছেন সামান্য কিছু আগে-পরে।

বিষ্ণু দে প্রথম থেকেই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন 'পরিচয়' এবং তার সম্পাদকের সঙ্গে। তবে দু-নম্বর চিঠির সাক্ষ্যে মনে প্রশ্ন জাগে, 'পরিচয়'-এর সম্পাদনার ব্যাপারে বিষ্ণু দে-র মনে কি সন্দেহ কিছু জাগছিল প্রথম থেকেই—যার তাড়নায় সুধীন্দ্রনাথকে লিখতে হয় "রুচির গরমিল থাকবেই" ? বিষ্ণু দে-ও জানান, "এই অমিল ও মিল প্রায়ই বিরোধী হলেও মৈত্রীমূলক হত। বোধহয় প্রথম থেকেই।" এবং সুধীন্দ্রনাথ ঐ একই চিঠিতে লিখেছেন, "পরিচয় সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে একদিন মন খুলে আলোচনা করতে চাই।…সেদিন দেখবেন আপনার আমার মতে কতখানি মিল রয়েছে।"

ফলে যে চিঠিতে বিষ্ণু দে রচনানির্বাচনের নীতির বিরুদ্ধে সম্ভবত ইঙ্গিত করেছিলেন সে চিঠিতেই তিনি 'পরিচয়'-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত সুধীন্দ্র-নাথের প্রবন্ধ 'কাব্যের মুক্তি'-র প্রশংসায় অকুণ্ঠ।[১০] বস্তুত প্রথম খসড়া থেকে শুরু করে পরিমার্জনার মধ্য দিয়ে প্রবন্ধটির বিকাশ কিভাবে ঘটল, তা তো তিনিই জানেন এবং নান্দনিক যাত্রারম্ভের ঐক্যে, এই মূল্যবান প্রবন্ধটি তাই যেন এই দুই বন্ধুর তৎকালীন কাব্যাদর্শের ইশ্‌তেহার বলেই গণ্য হবার যোগ্য।

প্রবন্ধটিতে টেনিসন-সুইনবর্ন-নন্দিত "উনিশ শতকী কাব্যের অন্তিম দুর্দশা",

অর্থাৎ "উনিশ শতকী ব্যক্তিবাদে"-র পচনের পাশে "বিংশ শতাব্দীর মূলমন্ত্র" "অবৈকল্য আর অকপটতা"-র মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কয়েকটি উদ্ধৃতির সাহায্যে প্রবন্ধটির দিক নির্দেশের চেষ্টা করা যায়:

১. "কবির উদ্দেশ্য তার চারপাশের অবচ্ছিন্ন জীবনের সঙ্গে প্রবহমান জীবনের সমীকরণ।"

২. "কবি যদি মহাকালের প্রসাদ চায়, তবে শুচিবায়ু তার অবশ্যবর্জনীয়। ..কারণ কাব্যের পথে উল্লঙ্ঘন চলে না।"

৩. "মহাপ্রাণ যেমন খণ্ডপ্রাণের বিসর্জনেই লভ্য, তেমনি মহাকাব্যের আরম্ভ সেইখানে, যেখানে ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অবসান।"

৪. "বিশ্বের সেই আদিম উর্বরতা আজ আর নেই। এখন সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজ সংগ্রহ না করলে কাব্যের কল্পতরু জন্মায় না।"

এরকম অজস্র উক্তি ও উপলব্ধিতেই প্রথম তৈরি হল আধুনিক কাব্যের প্রসঙ্গ ও প্রকরণের দার্শনিক পশ্চাদভূমি। দৃষ্টান্ত হিসেবে সুধীন্দ্রনাথের কলম থেকে অনায়াসে আসে ওয়েন, লরেন্স, পাউণ্ড এবং এলিঅট তো বটেই। বিষ্ণু দে-র ভাষায়, এই প্রথম "ইওরোপীয় সাহিত্যের মুক্তির চেষ্টা আমাদের সাহিত্যিক দিকে প্রতিভাত হল।"[১১]

'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেও এই প্রবন্ধটি ছাপা হয় ঘোষণা রূপে—কারণ জ্ঞানবিজ্ঞানের ও শিল্পসাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইওরোপে যে আধুনিকতা বা মুক্তির চর্চা ঘটছিল, তাকে স্বদেশের আঙিনায় এনে ফেলাটাই ছিল এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। ফলে "অভিজাত" পত্রিকা 'পরিচয়'-এর বিষয়ে সে-যুগের অনেকেরই ছিল ভীতি, হয়তো কিছুটা বিদ্বেষও। বুদ্ধদেব বসু তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন তাঁর স্মৃতিচারণায়।[১২] সে-যুগের উদ্দাম বেপরোয়া 'কল্লোলে'রও প্রায় এরকম প্রতিক্রিয়াই ঘটেছিল।

বিষ্ণু দে যখন 'পরিচয়'-এ এলেন, ভুল ভাবে হলেও কেউ কেউ অন্তত মনে করতেন, তিনি 'কল্লোল'-এরই লেখক—বোধহয় 'কল্লোলে' প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি লেখার জন্য বা হয়তো আরো বেশি 'কল্লোলে'র কিছু লেখকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের জন্য।[১৩] বিষ্ণু দে-ও অবশ্য কল্লোল-জীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণ গোপন করেন নি 'পরিচয়'-এর নবলব্ধ বন্ধুদের কাছে। শ্যামলকৃষ্ণ

ঘোষের ডায়েরিতে আছে, যদিও কিছু পরের কথা : "ফেরার পথে ট্রামে বিষ্ণু দে বলছিলেন কল্লোল সঙ্ঘের কথা। 'বেশ মজার দিন ছিল—একেবারে বোহেমীয় জীবন, কোনো কিছুতেই বাদবিচার ছিল না।' "[১৪]

এই সময়েই একটি কৌতুককর ঘটনার কথা বিষ্ণু দে তাই অনেককেই জানাতে পারেন—কীভাবে 'কল্লোল'-এর বন্ধুরা তাঁকে মনে করতেন 'পরিচয়'-এর লোক এবং খানিকটা বিদ্বিষ্টভাবেই জানতে চাওয়া হত তাঁর "ইনটেলেকচুয়াল" বন্ধুদের কথা—আর 'পরিচয়ে' গেলে 'কল্লোল'-এর লোক হিসেবে তাঁর কাছে ঈষৎ অবজ্ঞার সুরে জানতে চাইতেন সুধীন্দ্রনাথ তাঁর কুখ্যাত কল্লোলের বন্ধুদের কথা। বিষ্ণু দে দুটোই উপভোগ করতেন।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র বাড়িতে প্রতি শুক্রবার যে বৈঠক বসত, যাকে বলা হত 'শুক্রবারের বৈঠক', তার নিয়মিত সদস্য ছিলেন বিষ্ণু দে। এই বৈঠকের আবহাওয়াটা টের পাওয়া যায় হিরণকুমার সান্যাল বা শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের লেখায়।[১৫] হিরণবাবুর সাক্ষ্য থেকে জানতে পারি, আড্ডা বসতে নাকি শুরু করে 'পরিচয়'-প্রকাশের অল্প কিছু আগে থেকেই। উনি বলেছেন, বিষ্ণু দে আসতে শুরু করেন কিছু পরে। বিষ্ণু দে অবশ্য জানান, প্রথম থেকেই তিনি আমন্ত্রিত হতেন এবং 'পরিচয়'-এর প্রথম রচনা তো তিনি নিজের হাতেই পৌঁছে দেন সুধীন্দ্রনাথকে।

'শুক্রবারের বৈঠকে'র প্রাথমিক উদ্দেশ্য কিন্তু ছিল, "আড্ডা নয়—কাজ। অর্থাৎ রচনার নির্বাচন, রচনা সংগ্রহের ব্যবস্থা ও এই উদ্দেশ্যে বিবিধ ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ।"[১৬] কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল এটা হয়ে উঠেছে "নিছক আড্ডা"। এখানে লেখার দেওয়া-নেওয়া হত—অর্থাৎ আমন্ত্রিত লেখা জমা পড়ত বা লেখার প্রকাশযোগ্যতা বিচারের জন্য সুধীন্দ্রনাথ-নির্দিষ্ট বিচারকদের মধ্যে বণ্টন হত এবং সর্বোপরি সমালোচনার জন্য সুধীন্দ্রনাথ একেক জনকে বই দিতেন। কিন্তু লেখা বোধহয় পড়া হত না—শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের ডায়েরি পড়ে মনে হয় কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনাও নয়—বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে বিচরণ করতেন সদস্যরা। ওঁর কোনো এক দিনের ডায়েরিতে দেখি ডি এইচ লরেন্স, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, চীনা বা ইটালিয়ান

খাবার, ভূতের গল্প, স্বপ্নের ব্যাখ্যা, মাতালের আচরণ ইত্যাদি সবই এসেছে পর পর।[১৭]

নীরেন্দ্রনাথ রায় বোধহয় মাঝে মাঝে চেষ্টা করতেন আলোচনাকে সিরিয়স করে তোলার জন্য লেখা পাঠের ব্যবস্থা করতে। বিষ্ণু দে-র মনে আছে, অধ্যাপক তারক সেন এবং অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এসেছিলেন লেখা পড়তে (সুবোধচন্দ্র সম্ভবত শরৎচন্দ্র বিষয়ে)—"তাঁরা স্বতন্ত্রভাবেই আসেন 'পরিচয়'-এর উৎসাহী সভ্য নীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের আহ্বানে।" সুধীন্দ্রনাথ প্রতি বৈঠকেই "কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা" করতেন। বুদ্ধদেব বসু মাত্র কয়েকবারের অভিজ্ঞতাতেই লিখছেন: "হলুদ অথবা সবুজ রঙের নির্মল মেঝে, গভীর গদির অতি নমনীয় আসন, চায়ের বাসন আলো-ঠিকরোনো, ভোজ্যতালিকা উচ্চাঙ্গের। কোনোদিন থাকে উত্তর-কলকাতার গৌরববাহী বৃহদাকার শিঙারা সন্দেশ ইত্যাদি, কোনোদিন বা ফার্পো রেস্তোরাঁর অবদান—সবই সুপ্রচুর।"[১৮] সেদিনও খাবার এসেছিল পাঠের মাঝখানেই। মহা বিরক্ত হন সুবোধচন্দ্র। শুধু খাবারেই নয়, 'পরিচয়'-এর হাসিঠাট্টা গল্পগুজবের হালকা মেজাজে "অ্যাকাডেমিক দুজন অধ্যাপক···বেজার হয়েছিলেন।"

তবে মাঝে-মাঝেই বোধহয় বৈঠকের আলোচনায় যে গভীর দার্শনিক তার্কিকতা প্রকাশ পেত, যার মধ্যমণি, বা শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের ভাষায় "কর্ণধার" ছিলেন "মল্লিকদা", অর্থাৎ বসন্তকুমার মল্লিক, যিনি যুক্তির "গাম্ভীর্যহানি" কখনো বরদাস্ত করতেন না, সে-সবের বিষয়েও বিষ্ণু দে মনে মনে হাসতে পারতেন।[১৯] আর সত্যিই তো বুদ্ধদেব বসু যে-কথা বলেছেন, এই বিদ্বান ও তত্ত্বালোচনায় দক্ষ পরিবেশে "সৃষ্টিশীল লেখক" বলতে মাত্র দুজন—সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে। ফলে তত্ত্বালোচনার গাম্ভীর্যে অনেক সময়ই "রূপকের অর্থ-গভীরতা" যেত হারিয়ে।

তা ছাড়া, প্রথম থেকেই কেন যেন মনে হয় 'পরিচয়'-এর একটু বয়স্ক মণ্ডল থেকে বয়োকনিষ্ঠ বিষ্ণু দে একটু দূরে, 'পরিচয়'-এর একজন হয়েও একটু দূরে, কল্লোলের বোহেমিয়ান বন্ধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য ঈষৎ শঙ্কিত, কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির হাওয়া থেকে ভিন্ন এই জগতে যেন সামান্য আমন্ত্রিত-নিমন্ত্রিত ভাব।

এটা বিশেষ করে মনে হতে পেরেছে এই কারণেই যে সুধীন্দ্রনাথ পর পর বহু চিঠিতে ব্যগ্রভাবে শুক্রবারের বৈঠকে বিষ্ণু দে-র উপস্থিতি প্রার্থনা করেছেন। হয়তো এটা সুধীন্দ্রনাথের স্বভাবের সৌজন্যবোধেরই প্রমাণ—এবং তদুপরি বিষ্ণু দে-র "বুদ্ধির স্বাভাবিক প্রাখর্য" ও "অধীত বিদ্যার ব্যাপকতা" তো তখন সকলের কাছেই প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া বয়সের দিক থেকেও তিনি ছিলেন সবচেয়ে ছোট—ফলে অনেকেরই বিশেষ সস্নেহ পক্ষপাতিত্ব তাঁর উপর বর্ষিত হত।

এমনকি সুধীন্দ্রনাথ, যিনি শ্যামলকৃষ্ণের ভাষায় "চ্যাটাং চ্যাটাং কথা" বলায় ছিলেন ওস্তাদ বা হিরণ সান্যালের ভাষায় "মর্মঘাতী ব্যঙ্গে" দক্ষ, তিনিও বিষ্ণু দে-কে স্নেহে এবং শ্রদ্ধায় খাতির করেই চলতেন। বিষ্ণু-দের মনে আছে, "সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন সত্যিই বিদগ্ধ বন্ধুবৎসল, আড্ডাপতি মানুষ, ফলে এই অর্বাচীনকে মতান্তর-মনান্তর সত্ত্বেও কখনো পৃষ্ঠপেষণ সইতে হয় নি।"[২০] ফলে বিষ্ণু দে-র কখনোই মনে হয় নি, সুধীন্দ্রনাথের কথায় বড় বেশি তিক্ততা। শুধু তিনি জানতেন তর্ক করতে ভালোবাসেন সুধীন্দ্রনাথ।

একজনের সঙ্গে বোধহয় তাও করতেন না, তিনি সত্যেন্দ্রনাথ বসু। কাছাকাছি পাড়ারই বাসিন্দা সত্যেন্দ্রনাথের স্নেহ বিলোবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তিনি যেমন সুধীন্দ্রনাথের প্রতি স্নেহানুরক্ত ছিলেন, তেমনি শুক্রবারের আড্ডায় এলেই আড্ডার কনিষ্ঠ সদস্য বিষ্ণু দে-কেও প্রশ্রয় দিতেন সমান আগ্রহে। নীরেন্দ্রনাথ রায়ের (সত্যেন্দ্রনাথের আরেক "স্নেহের পাত্র" "বাল্যকাল থেকেই") দৌত্যে এবং সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগেই যে "মনীষার পৌরাণিক চরিত্র" সত্যেন্দ্রনাথ বসু-র কাছাকাছি পৌছনো গেল, সে-কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন বিষ্ণু দে: "এই পুরাণসম্ভব, যেন প্রায় অলৌকিক চরিত্রের সঙ্গে শ্রুতিগত পরিচয় প্রস্তুতি দিয়েছিল আমার মনকে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধের, যেটা ঘটল কুটুম্বিতার পর্যায়থেকে নবার্জিত বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের এক বৈঠকে 'কাব্যের মুক্তি'র প্রথম ভাষ্যটি পাঠ করার পরে, তাঁর পৈতৃক বাড়িতে, রাস্তার ধারে সেই চিত্রবিচিত্র পুতুলপাইক-শোভিত রোয়াকের পশ্চিমে অপরিসর অন্তরঙ্গ পড়ার ঘরে।"[২১] 'পরিচয়'-এর

বৈঠকে সুধীন্দ্রনাথ বা সত্যেন্দ্রনাথের আকর্ষণ তখন তাঁর কাছে প্রায় একটা ঘোরের মতো।

প্রশ্ন তবু জাগতেই পারে, 'শুক্রবারের বৈঠকে' কি তিনি মাঝে-মাঝে অনুপস্থিত থাকতেন—যার জন্য সুধীন্দ্রনাথের ঐ উৎকণ্ঠা? বিষ্ণু দে জানাচ্ছেন, "শুক্রবারের পরিচয়-বৈঠকে যাবার তাগাদা প্রায়ই ঘটত।…হয়তো মাঝে মাঝে অনুপস্থিত থেকেছি। কিন্তু সচরাচর থাকতুম।" ইতিমধ্যে কলেজ স্কোয়ারের যৌথ-পরিবার থেকে আলাদা হয়ে বিষ্ণু দে-র পিতা সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে বাসা করেছেন। ফলে ওখান থেকে হাতিবাগানে যাতায়াত করার আরো নাকি সুবিধা হল। এমনকি বি এ. পরীক্ষার দিনগুলিতেও নাকি শুক্রবারের আড্ডায় কামাই পড়ত না—ফলে প্রাক্তন মাস্টারমশাই নীরেন্দ্রনাথ রায়ের কাছে ধমক খেতে হত।

তবে 'পরিচয়' বা 'শুক্রবারের বৈঠক' নিরপেক্ষভাবেই দুই বন্ধুর অন্তরঙ্গতা গভীর হয়ে ওঠে। দুজনেই দুজনের সান্নিধ্য খুব পছন্দ করেন। সারাদিন হয়তো কেটে যায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-র "পুতুলপাইকশোভিত" বাড়িতে সুধীন্দ্রনাথের একান্ত প্রকোষ্ঠে—ঐ "অপরিসর অন্তরঙ্গ পড়ার ঘরে"—দুজনের শিল্পসাহিত্যসমাজের আলোচনায়। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের বাড়িতে দুই বন্ধুর এই ঠাসবুনট আড্ডা চলতে থাকে, অন্তত যতদিন পর্যন্ত না তিনি তাঁর নতুন বাড়ি হাজরা রোডে উঠে যান।

বিষ্ণু দে-র স্ত্রী প্রণতি দে-র অন্তরঙ্গ চিঠিটি এই প্রসঙ্গে খুব মজার: "আমাদের বিয়ে হয় ১৯৩৪-এর ডিসেম্বরে। তখন দেখতুম, যতদিন ভালো ছিলেন, সকালবেলা ১১টায় ভাত খেয়ে বেরিয়ে যেতেন সুধীনবাবুর বাড়ি, সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যা করে আসতেন। না হলে বাড়িতে বসে পড়তেন আর লিখতেন।…আর সুধীনবাবুর সঙ্গে আড্ডা দিতেন বলে, আমার মনে আছে, আমি ঝগড়াও করেছি খুব!! এমন অন্তরঙ্গতা ছিল তখন। বাবা (আমার শ্বশুর মহাশয়)-ও অনেক দিন বলেছেন ওঁকে, সুধীনকে বলো তোমাকে একটু কিছু খেতে দিতে—অবশ্য সে কখনও বলেন নি, বলতে

পারতেনও না কখনও। কাজেই শরীরও খারাপ হতে পারত। অবশ্যি তখন শরীর খারাপ হয়নি।…"[২২]

এই অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও, ভুললে চলবে না, উভয়ের সূক্ষ্ম রুচি ও শালীনতার বোধ আলাপে-সম্বোধনে-আচরণে একটু সম্ভ্রমের দূরত্ব বোধহয় রেখেই চলত, অন্তত চিঠি পড়ে তো তাই মনে হয়।

কি আলোচনা হত? প্রণতি দে-ই জানান, "সুধীনবাবুর সঙ্গে খুব কবিতা বিষয়ে নতুন বই নিয়ে আলোচনা হত।" আসলে বিষয়ের কোনো বাঁধ ছিল না—দুজনেই নানা বিষয়ের পড়ুয়া—মত-বিনিময় হত—হয়তো মতের ঐক্য অনেক সময়ই ঘটত না। সাহিত্য-বিষয়েও, প্রাথমিক প্রেরণার মিলকে ছাপিয়ে, ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে উভয়ের "ধর্ম"-এর অমিলের কথা। সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন চিঠিতে: "আমি যেহেতু সাহিত্যের অবৈকল্য আর জীবনের সত্যতা সমপর্য্যায়ের বলে ভাবি না, তাই আমার পক্ষে কবিতার formalness দোষের নয়। কিন্তু আপনার ধর্ম্ম তো অন্য ধরণের…।"

নিজের কবিতাপাঠও চলে অবশ্যই। তা নিয়ে আলোচনাও। বিষ্ণু দে-র 'উর্বশী ও আর্টেমিস' তো ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গেছে ১৯৩২-এ। বিষ্ণু দে-র মনে হয়, "উর্বশী ও আর্টেমিস-এর বিষয়ে [সুধীন্দ্রনাথের] হয়তো মানসিক বাধা একটু ছিল"—তাই "মুখে আলোচনা"-র কথা বলছেন চিঠিতে—"কিন্তু তারিফও ছিল", বিষ্ণু দে জানতেন। এখন লেখা চলছে 'চোরাবালি'-র একেকটি কবিতা—সে-সব কবিতা সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের মহা উৎসাহ। 'চোরাবালি'-গ্রন্থের কবিতা নিয়ে "সুধীন্দ্রনাথ লিখতে চান এবং মাসখানেক ধরে আলোচনা করে লেখেন" তাঁর ঐ বহু-আলোচিত প্রবন্ধটি। 'চোরাবালি' গ্রন্থ ঐ প্রবন্ধ-ভূমিকা সহ বেরোয় ১৯৩৭ সালে—কাব্যরচনা ও যৌথকাব্যপাঠের চমৎকার উদাহরণ।

তার ঠিক দুই-বছর আগে, ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বরে, 'তন্বী'-প্রকাশের চার-পাঁচ বছর পরে, বেরোয় সুধীন্দ্রনাথের 'অর্কেস্ট্রা'। বই বেরোনো মাত্র বন্ধুকে কপি পাঠিয়ে সুধীন্দ্রনাথ "সমালোচনা"-র "প্রতিশ্রুতি" স্মরণ করিয়ে দেন—কারণ বন্ধুর "কাব্যবিবেচনা"-কে তিনি শ্রদ্ধা করেন। বলা বাহুল্য, বিষ্ণু দে অচিরে প্রবন্ধটি লিখে পাঠান সুধীন্দ্রনাথেরই কাছে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য-সম্পাদিত

'পূর্বাশা'-য় প্রকাশের জন্য। কিছু পরে সেটি বোধহয় 'পূর্বাশা'-য় ছাপাও হয়।[২৩] প্রবন্ধটিতে কি লেখা হয়েছিল জানি না, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ বন্ধুর "অত্যাশ্চর্য কাব্যজিজ্ঞাসার নমুনা"-য় উচ্ছ্বসিত। সুধীন্দ্রনাথ অবশ্য আপত্তি জানিয়েছেন, তাঁর কবিতার প্রসঙ্গে মিলটন ও রাসিনের উল্লেখে, তিনি বরং তুলনীয় হতে চান মালার্মে ও বেভোজের সঙ্গে। প্রবন্ধটির সামান্য মাত্র আভাস পাওয়া যায় সুধীন্দ্রনাথের এই বিক্ষোভে। বক্তব্য যাই হোক, উভয়ের কাব্য-উপভোগের ও পারস্পরিক রসগ্রাহিতার উদাহরণ যেমন একদিকে 'চোরাবালি'-বিষয়ে সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ, তেমনি আরেক দিকে সুধীন্দ্রনাথের ঐ দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অর্কেস্ট্রা'-বিষয়ে বিষ্ণু দে-র "রিভিউ"। দুটি প্রবন্ধই প্রায় একই সময়ে রচিত।

বন্ধুত্বের এই উজ্জীবনেই বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথকে 'চোরাবালি'-র যে কপিটি উপহার দেন, তার নামপত্রে নিজের হাতে লেখেন :

"শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বন্ধুপ্রাজ্ঞসচিবেষু প্রিয়বরেষু চ"

এবং তার নীচে দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' থেকে উদ্ধৃতি, ভার্জিলের কাছে দান্তে যেখানে চাইছেন পথনির্দেশ : "Poeta che mi guidi/guarda la mia irrtu, s'ella e possente,/prima che all' alto passo tu mi fidi" [কবি, যে তুমি আমাকে পথ দেখাচ্ছ, এই কঠিন পথে বিশ্বাস করে নিয়ে যাওয়ার আগে, দেখ সত্যিই আমার মধ্যে কিছু যোগ্যতা আছে কিনা]—এবং তার নীচে

"বিষ্ণু দে/২৪ শে পৌষ, ১৩৪৪।"[২৪]

ইতিমধ্যে জীবনবোধে, হয়তো সেই সূত্রে কাব্যবোধেও একটা বিভেদের দেওয়াল উঠতে শুরু করেছে দুজনের মাঝখানে। ১৯৩৮-এই দেখা যায় কবিতা-সম্পর্কে "তর্ক" উঁচিয়ে উঠছে এবং বিষ্ণু দে-র কাছে মনে হচ্ছে "কল্পিত সুধীন্দ্রদত্তের সঙ্গে বাস্তব সুধীন্দ্রদত্তের" তফাৎ। অর্থাৎ বন্ধুর কাছ থেকে বোধহয় আশাভঙ্গের কারণ ঘটছে।

বিষ্ণু দে তাঁর কবিতায় ও মননে যে দ্রুত পরিবর্তন ও বিকাশের মধ্য দিয়ে চলেছেন এ-সময়ে, মহাযুদ্ধ-পূর্ব সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটে বরণ করে

নিয়েছেন প্রগতিক জীবনচেতনা, মার্কসবাদী ধ্যানধারণা—তাঁর নিজেরই ভাষায় "উর্বশী ও আর্টেমিস আর চোরাবালি-র পর পূর্বলেখ-র ডাইরেকশনে"[২৫]—সেই বাঁকবদল কি তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন বন্ধু সুধীন্দ্রনাথেরও চিন্তায় ও কর্মে ?

অবশ্য 'পূর্বলেখ' তখনও বেরোয় নি, লেখা হচ্ছে মাত্র এবং সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে শত মতভেদ সত্ত্বেও রাজনৈতিক মতৈক্যের একটা জমি তখনও ছিল। সুধীন্দ্রনাথ অবশ্য কখনই মার্কসবাদী বা কমিউনিস্ট ছিলেন না—কিন্তু "মুখে মার্কস-ভক্তি" নাকি দেখাতেন—রুশ বিপ্লবে, সে-যুগের প্রায় সমস্ত শিক্ষিত বাঙালির মতোই, আলোড়িতও হয়েছিলেন যৌবনে। পরে এমনকি তাঁর আমলেও বহু মার্কসবাদী লেখকের সম্মানিত স্থান ছিল 'পরিচয়'-এ। সুশোভন সরকার লিখছেন, "প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সর্বদা নিজেকে প্রগতি-বিরোধী বলে প্রচার করতে ভালোবাসত আর ইডিওলজিতে তার আস্থা ছিল না, ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ছিল তার জীবনের মূলমন্ত্র। অথচ তার চারদিকে সেদিনের প্রগতিশীল লেখকেরা ধীরে ধীরে জড়ো হতে থাকে, সকলকে পছন্দ না করলেও সে কাউকে দূরে ঠেলে দিত না। প্রগতিশীলদের মধ্যে অনেকে মার্কসবাদী ছিল কিংবা হয়ে ওঠে, সমমতের লোকেদের সাপ্তাহিক আড্ডায় চক্রে টেনে আনে। 'পরিচয়'-এর সে-যুগের প্রগতিশীল লেখা জেলে ও জেলের বাইরে কমিউনিস্ট-কর্মীরা কি উৎসুক আগ্রহ নিয়ে পড়তেন সে-কথা তাঁদের মুখেই শুনেছি।"[২৬]

'পরিচয়'-এর "নিছক আড্ডা"-র মেজাজ অবশ্য পালটাতে থাকে আগে থেকেই। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ খেয়াল করেছেন, ১৯৩৮ থেকেই নাকি "পরিচয় আসরে···বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক বচসা আর মন্ত্রীদের কেচ্ছা কাহিনী কমে গিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোড়ন বেড়েছে।···সভ্যদের মতামত ক্রমশ অসহিষ্ণু ও পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে উঠছে।"[২৭] ঐ বছরই প্রগতি লেখক সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীতে যোগ দিতে রাজি হন সুধীন্দ্রনাথ। একদিন বক্তৃতাও দেন ইংরেজি ভাষায়—পরনে যদিও লম্বাঝুল পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি ও কাঁধে কাশ্মীরী শাল। "তিনি যা বললেন তার মোদ্দা কথা হল, চণ্ডীদাসের সময় থেকে বাংলা দেশে সকল বৃহৎ শিল্পের প্রেরণা জুগিয়েছে

সাধারণ মানুষ।… সাহিত্যে প্রগতিকে গতিশীল রেখেছে দেশের জনসাধারণ।” …ইত্যাদি।[২৮] সে-সময়ের বন্ধু মার্কসবাদী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়: “সহজাত দাক্ষিণ্য নিয়ে আমাদের মতো লোকের খুব কাছে তিনি এসেছিলেন—শুধু যে ব্যক্তিগতভাবে বন্নে জহীর আর আবদুল আলীমকে অভ্যর্থনা, কিংবা প্রগতি লেখক সম্মেলনকালে স্বগৃহে প্রখ্যাত উর্দু কবি মজাজ এবং তখন একান্ত তরুণ আলী সর্দার জাফ্রি-কে সমাদরে স্থান দিয়েছেন তা নয়।…যখন তাঁর প্রতিভা ও চারিত্র্যের মধ্যাহ্ন…তখন কম্যুনিজমকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন, বৈরীভাবে হলেও অভিবাদনে কুণ্ঠিত হতেন না।”[২৯] ফ্যাশিস্ট-বিরোধী মনোভাবও ছিল তাঁর গভীর। এমনকি ১৯৩৯-এ ‘এইড স্পেন’ বা পরে ‘এইড চায়না’-র ব্যাপারেও নাকি তাঁর উৎসাহ ছিল।

সুধীন্দ্রনাথের চিন্তাজগতের একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটল যুদ্ধের সময়। এডওয়ার্ড শিল্স্-এর জীবনালেখ্যে বলা হয়েছে: “যুদ্ধের আবির্ভাব সমসাময়িকদের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের সম্পর্ককে জটিল করে তুলল।”[৩০] এই সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের আচরণ তাঁকে কামউনিস্টদের পন্থা সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করেছিল। ফিনল্যাণ্ডে সোভিয়েটের বোমাবর্ষণ কিংবা হিটলারের সঙ্গে স্ট্যালিনের চুক্তি—এই সব ঘটনা তাঁকে খুবই বিচলিত করে—হীরেনবাবু প্রমুখ কমিউনিস্ট বন্ধুদের কোনো যুক্তি (সোভিয়েটের নিঃসঙ্গতার বিপদ, সময়হরণের প্রয়োজন, আদর্শ ও কৌশলের সম্পর্ক ইত্যাদি) তিনি মানতে রাজি নন। তাঁর আদর্শবাদ নিদারুণভাবে আহত। এই সময় বিষ্ণু-দের সঙ্গেও কবিতা ছাড়িয়ে এই রাজনৈতিক মতপার্থক্যের সূত্রে কখনও কখনও তর্ক ঘটে যায়। ক্রমশ দূরত্ব বাড়তে থাকে।

কিন্তু বন্ধুর ঋণ কি এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া সম্ভব? তাই ১৯৪১ সালে যখন ‘পূর্বলেখ’ বেরোয়, তখন আগের মতোই ঐ গ্রন্থটি উপহার দেওয়ার সময় বিষ্ণু দে নামপত্রে স্বহস্তে লিখে দেন:

“সুধীন্দ্রনাথদত্ত সহায়মিত্রেষু

I found, or thought I found, you did execeed/the barren tender of a poet's debt./বিষ্ণু/১০. ৯. ৪১”[৩১]

কিন্তু ইতিমধ্যে উভয়ের পথ গেছে আরো আলাদা হয়ে—“অভিন্ন মনন”

রূপ পেয়েছে "উচ্চ মতান্তরে"। আর তারই ফলে কাব্যবোধে উভয়ের ব্যবধানটা হয়ে ওঠে তীব্রতর, সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে আর 'পূর্বলেখ'-র বিষয়ে কোনো রকম "অনুকম্পা" ও সংযোগ অনুভব করা হয়ে ওঠে অসম্ভব। হয়তো প্রগতিমূলক রাজনীতি ও সাহিত্য আন্দোলনে ব্যস্ত (এ রকম ব্যস্ত অংশগ্রহণ বোধহয় বিষ্ণু দে-র জীবনে আর কখনও ঘটে নি)[৩২] বিষ্ণু দে-র সঙ্গে তাঁর সব রকমের যোগাযোগই সেই কারণে ক্ষীণ হয়ে আসে, বেশ কটি বছর।

অবশ্য এই দূরত্বটা শুধু রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক বা এমনকি দার্শনিক মতপার্থক্যের কারণেই মনে করলে ভুল হবে। এই সময় থেকেই, হয়তো কিছু আগে থেকেই, সুধীন্দ্রনাথের পারিবারিক জীবনে কতকগুলি পরিবর্তন ঘটতে থাকে। প্রথমা স্ত্রী ছবি-র সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে। জানি না, এ-সময়ের অভিজ্ঞতার বশেই তিনি বলতেন কিনা, "প্রেম নয়, ঈর্ষাই" মানুষের মহত্তর অনুভূতি—শেকস্পিয়রের 'ওথেলো' নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে এটাই ছিল তাঁর মাপকাঠি।[৩৩] দুজনের মধ্যে মিটমাটের জন্য সুধীন্দ্রনাথের বহু পুরোনো বন্ধুর আগ্রহের অন্ত ছিল না—এমনকি যামিনী রায় বা সত্যেন্দ্রনাথ বসু-রও[৩৪]—১৮ নং চিঠির মধুপুর-ভ্রমণের উদ্দেশ্যও ছিল তা-ই। কিন্তু সবই বোধহয় ব্যর্থ হল। এ-ছাড়াও সুধীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে এমন কতকগুলি নতুন ঘটনা বা পরিবর্তনকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন এ-সময় যে, তাঁর পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় তাঁর বন্ধুত্বের পরিমণ্ডল থেকে খসে যেতে থাকেন।[৩৫] হয়তো এই পরিবর্তনের বীজ ছিল আগেই, তাঁর চরিত্রের মধ্যেই নিহিত, জীবনযাপনের কিছুটা তথাকথিত অসামাজিক বিশৃঙ্খলায় বা পক্ষপাতিত্বে।[৩৬] কিন্তু এখন নিজেকে তিনি আরো ছেড়ে দিলেন সেই স্রোতে—তাঁর নিজেরই ভাষায় "শান্তির চেয়ে স্বধর্মে"র প্রেরণায় "বিপরীত স্রোতে"—ইঙ্গবঙ্গসমাজ-শোভন তরল জীবনরঙ্গে—তাঁর এ-সময়েরই একটি কবিতা থেকে বাঁকা করে বলা যায়: লীলার টেলিফোন-প্রতীক্ষায়, দীপ্তির মতো রঙ্গিলার প্রতিতুলনায়, বাচাল যুবা আর্থিক-সম্ভাবনাময় প্রমথ-র সাফল্যে, প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতিভঙ্গের হাসিকান্নায় ('সংবর্ত', ১৯৪০)। এ সময়ই তিনি

কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের বাড়ি ছেড়ে উঠে আসেন হাজরা রোডের বাড়িতে। সেখান থেকে হালকা বেলেয়ারি গলায় বলেন চিঠিতে: "শীলা-জন, আইলিন-টম গোলাপ ফুলের রং মেখে সিমলা থেকে ফিরে, কলকাতার বিপক্ষে মানহানিকর কথাবার্ত্তা কয়ে বেড়াচ্ছে।"

১৯৪৩ সালে সুধীন্দ্রনাথ 'পরিচয়'-এর স্বত্ব ছেড়ে দিলেন—বস্তুত বেচে দিলেন কমিউনিস্টদের কাছে।[৩৭] পত্রিকা চালানোর মতো মানসিক অবস্থা বা বাস্তব পরিস্থিতি ছিল না তাঁর তখন। এবং ঠিক ঐ বছরই তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন রাজেশ্বরী বাসুদেব-কে। মার্কসবাদ বা কমিউনিজম সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের ক্ষীণতম উৎসাহ তো ইতিমধ্যেই উবে গিয়েছিল—এ সময় থেকে তিনি প্রায় ঘোরতরভাবে কমিউনিস্ট-বিরোধী হয়ে ওঠেন—বিষ্ণু দে-র ভাষায় "যথোচিতভাবে বামপন্থাবিরোধী"। মানবেন্দ্রনাথ রায় বা এম এন রায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও বন্ধুত্বও ঘটে এখন—যদিও আগে থেকেই পরিচিতি ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল বোধহয়—'পরিচয়'-এর বৈঠকের ১৯৩৮-এর বিবরণীসূত্রে শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ লিখছেন, "মানবেন্দ্র রায় রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করার ফলে জল্পনা কল্পনার পরিধি বেড়েছে।"[৩৮] কিন্তু উভয়ের পত্রালাপের প্রথম চিঠিটি দেখছি ১৯৪৪-এ।[৩৯] হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "কম্যুনিজম সম্বন্ধে তাঁর সংশয় যায় নি, ইংরেজসুলভ ভণ্ডামিতে ভরা গণতন্ত্রের বুকনি অসার জেনেও সম্মতি গেল সেই দিকে ['অগতির গতি মধ্যপন্থা'], মানবেন্দ্র রায়ের তৎকালীন বন্ধু সুশীল দে (আই. সি. এস), বহুদিনের পরিচিত এবং কিছুকাল পার্লামেন্টে সতীর্থ বীরেন রায় (বেহালার বিখ্যাত বাসিন্দা) এবং সুধীন্দ্রনাথকে নিয়ে এম. এন. রায়ের মেলামেশা তখন খুব চলছিল।"[৪০]

যদিও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে তাঁর মতামতের এ-সময়ে খুবই নৈকট্য ছিল, এমনকি ১৯৪৫-৪৬ থেকে যে 'মার্কসিয়ান ওয়ে' প্রকাশিত হয়, মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তার অন্যতম উদ্যোক্তাও ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ, এবং শীতকালের প্রতি সন্ধ্যায় এম এন রায় ও তাঁর স্ত্রী এলেন রায় হয় রাসেল স্ট্রিটে সুধীন্দ্রনাথের ফ্ল্যাটে অথবা স্টোর রোডে সুশীল দে-র বাসায় মিলিত হতেন, তবু সুধীন্দ্রনাথ মানবেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত

হয়েছিলেন এ-কথা বললে ভুল হবে—ম্যালকম ম্যাগারিজ যে-কথা বলেছেন, কোনো রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গেই কোনোদিন তিনি একাত্ম হন নি।[৪১]

আসলে সুধীন্দ্রনাথ তখন ছিলেন মনেপ্রাণে একান্তই নিঃসঙ্গ—অসামান্য মনীষা ও মানসিক আভিজাত্য সত্ত্বেও তাঁর কোনো অবলম্বন ছিল না—"নিরালম্ব নৈরাশ্যের নিঃসঙ্গ আঁধারে"-ই তাঁর অবস্থান। তিনি ছিলেন আদ্যন্ত ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, ইণ্ডিভিজুয়ালিস্ট। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা অথচ চরিত্রের মধ্যে নিহিত এক প্রচণ্ডতা, যা থেকে হয়তো আসে তাঁর অস্মিতা, একটা তীব্র নিঃসীম শূন্যতা এনে দিয়েছিল তাঁর মধ্যে।

পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দূরত্ব—'নতুন' বন্ধুদের সঙ্গে 'নতুন' ধরনের যোগাযোগ—এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক মতামতের ঝোঁক তো বটেই—ক্রমশ তাঁকে নিয়ে গেল এডওয়ার্ড শিলস-এর মাধ্যমে কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডমের সান্নিধ্যে,'মুক্তবিশ্বে'র প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার পরিধিতে। স্টেটসম্যানের চাকরির সময় থেকেই তো তিনি বাংলায় কথা বলাও প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন। সাহিত্যসংস্কৃতির ব্যাপারেই যেন তাঁর প্রবল অনীহা। তাঁর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'উত্তরফাল্গুনী' এবং পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'সংবর্ত'-র মধ্যে প্রকাশকালের ব্যবধান দীর্ঘ ১৩ বছর। পরন্তু 'সংবর্ত'-তেও ১৯৪১ সালে রচিত কবিতার পর ১৯৪৫ সালে মাত্র দুটি কবিতা লেখেন এবং তারও দীর্ঘকাল পরে ১৯৫৩-তে তিনটি কবিতা। ১৯৪৭ সালে চিঠিতে লেখেন, "আমার লেখার যুগ অতীত হয়ে গেছে।" যে সব নতুন 'সাহেব' বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতেন, তাঁরা আর যাই হোক সৃষ্টিশীল সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত নন। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগের ছিন্নসূত্র আবার কালক্রমে হয়তো জোড়া লাগে আস্তে আস্তে—অন্তত কারো কারো সঙ্গে তো বটেই—কিন্তু সেই পুরোনো উত্তাপ কি আর সহজে ফেরে! বিষ্ণু দে-র সঙ্গেও দেখছি আবার পত্রালাপ ঘটছে—১৯৪১-এর পরে ১৯৪৭-এ।

সুধীন্দ্রনাথের এই "বিবিক্তি" কতটা প্রবল হয়েছিল, তা বোঝা যায় যখন আমরা জানতে পারি ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৬-এর মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গার অভিজ্ঞতা কিংবা আরো পরে ১৯৪৮-এ গান্ধীর মৃত্যু তাঁকে এত দূর অবসন্ন

করেছিল যে তিনি স্থায়ীভাবে দেশত্যাগের কথা ভেবেছিলেন, এমনকি লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে বাংলার অধ্যাপকের চাকরি নিয়ে।[৪২]

সময়টা অবশ্য বিষ্ণু দে-র পক্ষেও খুব সংকটের। ব্যক্তিগত বোধের সামাজিক-রাজনৈতিক সংকটকে তিনি রূপান্তরিত করছেন কবিতার সিদ্ধিতে। আশ্চর্যের বিষয়, এই সংকটের সময়ই তিনি আবিষ্কার করলেন তাঁর পরিণত কাব্যভাষা—পেয়ে গেলেন তাঁর নিজস্ব স্বতন্ত্র উচ্চারণ—'সন্দীপের চর' থেকে বেদনা ও বিশ্বাসের কাব্য 'অন্বিষ্টে' পৌছনোর অভিজ্ঞতায়।

কিন্তু তখনও, সুধীন্দ্রনাথের আত্মসংকোচনের অর্থ যাই হোক না কেন, বিষ্ণু দে বন্ধুর বিষয়ে আগ্রহী। তাঁর রাজনীতি তাঁকে বাধ্যতই দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বটে—কিন্তু সে-রাজনীতিরও তো আছে নিজস্ব সমস্যা, ভ্রান্তি, বিচ্যুতি। তাই ১৯৪৮ সাল নাগাদ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাল রেখে যখন শিল্পসাহিত্যের বিচারেও রাজনৈতিক মাপকাঠিটা বড় হয়ে উঠল, তখন ঐ ঝ্দাভনীয় ভ্রান্তিতে বিষ্ণু দে-র ভূমিকা ছিল প্রতিবাদী। সে কারণেই বিষ্ণু দে-কে বলতে শোনা যায় এ-সময়, যাঁদের সঙ্গে রাজনীতির মিল সাহিত্যসংস্কৃতির বোধে তাঁদের সঙ্গে এক হয়ে চলা দুঃসাধ্য, আর সাহিত্যসংস্কৃতিবোধের দিক থেকে যাঁরা শ্রদ্ধেয় সঙ্গী, তাঁদের সঙ্গে রাজনীতির বাধা দুস্তর।[৪৩] ফলে নিন্দার ঝড় বইবে জেনেও বিষ্ণু দে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা ও কাব্যবোধ বিষয়ে শ্রদ্ধা প্রকাশে অকুণ্ঠ, কিংবা বলা যায়, মত ও পথের ব্যবধান সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্যিক রুচির সীমানায় সুধীন্দ্রনাথের স্থান ছিল অম্লান। তাই যাঁদের সঙ্গে "মত ও পথের মিল" তাঁদেরই সাহিত্যরুচির অন্ধতার প্রতিবাদে তিনি যখন স্বতন্ত্র পত্রিকা ('সাহিত্যপত্র') প্রকাশে উদ্যোগ নেন ১৯৪৮ সালে, তখন সুধীন্দ্রনাথের রচনা বা অনুবাদ তাতে ছাপানোর জন্য তাঁর মুহুর্মুহু তাগাদা অকপট।

সুধীন্দ্রনাথই বরং যেন নিজেকে সরিয়ে নিতে চান—তাই 'সন্দীপের চর'-এর বিষয়ে যেমন তিনি নিরুত্তম, তেমনি বারবার অনুরোধের ফলে "পুনর্লিখিত কৈশোর রচনা" পাঠান ঠিকই কিন্তু 'সাহিত্যপত্রে'র "সমষ্টিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী"তে বীতরাগ। অবশ্য এটাও ঠিক লেখার ব্যাপারে বন্ধ্যাত্বজনিত এই

সংকোচ ও বিব্রতভাবের বড় হেতু দীর্ঘদিনের অনভ্যাস, এবং হয়তো তাঁর অভিজ্ঞতার ধরনেই নিহিত প্রেরণার অভাব। কিন্তু, বিষ্ণু দে, দেখা যায়, এই বাধাকে দূরে ঠেলে দিতে চান, দীর্ঘদিনের সংযোগহীনতাকে ঘোচাতে চান—সুধীন্দ্রনাথের কারণেও বটে, আমাদের সাহিত্যজগতের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যও হয়তো।

ঠিক সেই কারণেই ১৯৪৫ সাল নাগাদ, রাজনৈতিক মতানৈক্যের ঐ দূরত্বের দিনেই, ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের উদ্যোগে চাঁদা তোলার জন্য আশুতোষ কলেজে যে নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তাতে বিষ্ণু দে-র প্ররোচনায় যে-নাটকটি অভিনয়ের জন্য বেছে নেওয়া হয় তা হল ইয়েটসের *Resurrection* কাব্যনাটিকাটির সুধীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ 'পুনরুজ্জীবন'। সুধীন্দ্রনাথ-অনূদিত নাটিকাটির মহড়া-পরিচালনা ও প্রযোজনা করতেন বিষ্ণু দে স্বয়ং। অদ্ভুত যোগাযোগ। "অভিনয়ের প্রয়োজনে" কিছু কাটছাটের প্রস্তাব করেন কেউ কেউ, কিন্তু বিষ্ণু দে রাজি হন নি, কারণ "নাট্যকার এবং অনুবাদক—উভয়ের প্রতিভায় তাঁর অটল আস্থা।"[৪৪]

এই আস্থার ভিত সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অবশ্য নাড়া খেয়েছে। তাই 'অন্বিষ্টে'র ব্যাপারে অনেক 'কিন্তু' 'যদিও' করে অবশেষে লেখেন, "শক্ত লাগছে"। ১৯৪৪ থেকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' সাড়া জাগিয়েছে —বিষ্ণু দে সেই উদ্যোগের একজন উৎসাহী সক্রিয় সমর্থক। সুধীন্দ্রনাথের সে-সময়ের মনোভাব জেনেও তিনি 'নবান্ন' দেখতে যাওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন, টিকিট পাঠিয়ে দেন, 'স্টেটসম্যানে' সমালোচনার জন্য—কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ সামান্য উদ্যোগ গ্রহণেও নারাজ, বিস্তর টালবাহানার পর টিকিট দুটো হারিয়ে ফেলতেও পারেন।

নন্দনের যে মৈত্রীতে বিষ্ণু দে তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ ('সাহিত্যের ভবিষ্যৎ') একই সঙ্গে কমিউনিস্ট বন্ধু হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও কমিউনিস্ট-বিরোধী বন্ধু সুধীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন, তার "উপাদেয় ডায়ালেকৃটিক"[৪৫] উপভোগ করেও সুধীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর বামপন্থাবিরোধিতার তিক্ততাকে শেষপর্যন্ত গোপন করতে পারেন নি।

অবশ্য সব রকম আপত্তি-অনুপপত্তি সত্ত্বেও দান-প্রতিদান চলেই। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি সংস্করণ দিতে ভোলেন না, কনিষ্ঠ বন্ধুর প্রশংসায় উৎসাহিত হন। বিষ্ণু দে-ও তাঁর কাব্যের বা প্রবন্ধের বা অনুবাদের বইয়ের কপি পাঠিয়ে মতামত জানতে চান, কারণ সুধীন্দ্রনাথের সমালোচনা তাঁকে "স্টিম্যুলেট" করে।

রাজনীতি ও সংস্কৃতি : সমস্ত বিষয়েই মতপার্থক্য যখন উভয়ের সম্পর্কের উপর ছায়া ফেলে, এমনকি তখনও, কাব্যবিবেচনায় পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মনোযোগ কিন্তু হারায় না। সুধীন্দ্রনাথ যখন ১৯৫৪-তে 'অর্কেস্ট্রা'-র দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠান, তখন ঐ গ্রন্থের ব্যাপক পুনর্লিখন বা সংশোধন বিষ্ণু দে-কে "উত্তেজিত" করে। প্রগল্‌ভতা বা স্বতঃস্ফূর্ততার বিরোধী এই আত্মসচেতনতার নন্দন অবশ্য বন্ধুত্বের প্রথম পর্বেই বিষ্ণু দে-কে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করেছিল (যে আত্মসচেতনতার বিষয়ে সে-যুগে বুদ্ধদেব বসু-র মতো প্রেরণাবাদীরা অনেক ঠাট্টা ও সন্দেহ করেছেন)। তাঁর কাছ থেকেই জানতে পারি, সুধীন্দ্রনাথের কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের বাড়িতে এক দিনের অভিজ্ঞতার কথা। সেদিন সুধীনবাবু বেরিয়ে গিয়েছিলেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাড়িতে ছিলেন। বিষ্ণু দে-র হঠাৎ চোখ পড়ে যায় সুধীন্দ্রনাথের একটি খোলা খাতার ওপর—কাটাকুটি, বানানভুল, বারংবার সংশোধন—অসাধারণ পরিশ্রমের চিহ্ন।[৪৫] বিষ্ণু দে-র মনে খুব "তারিফ" জমা ছিল সে-সময় থেকেই। 'উটপাখি' কবিতাটি ত্রিশ বার দু-বছর ধরে পুনর্লিখন করেছেন জেনে বিষ্ণু দে বলেন, "নির্ভুল কবিতা। আমি মুগ্ধ।" নিজের কবিতা বিষয়ে সুধীন্দ্রনাথ অবশ্য বরাবরই পরিশ্রমী—বারবার সংশোধন না করে তাঁর তৃপ্তি ছিল না।

ঠিক সে-রকমই ১৯৫৬ সালেও সুধীন্দ্রনাথ 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' বা 'হে বিদেশী ফুল' হাতে পেয়ে বন্ধুর "সৃজনীশক্তির প্রাচুর্যে" কৃতজ্ঞতা জানাতে থাকেন।

কিন্তু এ-কথা ভুললে অন্যায় হবে যে কাব্যবোধে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও নান্দনিক যাত্রারম্ভে সুনিশ্চিত ঐক্য সত্ত্বেও—উভয়ের "মত ও পথের স্বভাবসিদ্ধ বৈপরীত্য" ছিল প্রথম থেকে—এমনকি 'চোরাবালি'-র যুগ থেকেই। পরবর্তীকালে যে-সব প্রকরণগত অভিযোগ সোচ্চার হয়েছে তাঁর চিঠিতে,

সে-সবের স্পষ্ট ইঙ্গিত তার 'চোরাবালি'-বিষয়ক প্রবন্ধেই আছে। তিনি সেখানেই লিখেছেন, "বিষ্ণু দে-র স্বকীয় তাল-লয়-মানে অত্যাশ্চর্য শ্রুতি-শুদ্ধির পরিচয় থাকলেও, তার বাক্যযোজনা মাঝে মাঝে দোষাবহ, ক্রিয়াপদের অপব্যবহার অল্প-বিস্তর অস্বস্তিকর, শব্দনির্বাচন যে-পরিমাণে অনুষঙ্গবাহী, সে অনুপাতে অভিধানসম্মত নয়।"[৪৬] ঐ প্রবন্ধে অবশ্য দৃষ্টান্ত দেওয়ার অবকাশ তাঁর ছিল না বা বন্ধুর প্রতি মোহপ্রবণতায় সে-সুযোগ তিনি নিতেও চান নি। কিন্তু অনেক বছর পরে ১৯৫৩-তে 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' সম্পর্কিত চিঠিতে তিনি দৃষ্টান্তসহ প্রায় একই অভিযোগ করেন। সেই দৃষ্টান্তগুলি পাঠ করে আজ যদি কোনো পাঠকের মনে হয়, সুধীন্দ্রনাথ ব্যাকরণের যূপকাষ্ঠে আবেগতাড়িত জীবন্ত ভাষার লজিককে নিধন করতে চান, তবে তিনি তার মতের সপক্ষে 'চোরাবালি' প্রবন্ধ থেকেই সুধীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করতে পারেন। ঐ ত্রুটিনির্দেশের অব্যবহিত পূর্বে তিনি লিখেছেন, "স্বাধীনতার মূল্য হিসাবে তিনি কখনও কথ্যরীতি ভুলে যান নি, বৈয়াকরণিক বিধি-নিষেধে সাধারণত জলাঞ্জলি দেন নি, সচরাচর মনে রেখেছেন যে গদ্য হোক, পদ্য হোক, কাব্যের ভাষা জীবন্ত ; এবং জীবন্ত ভাষা যেমন একাধারে লৌকিক ও ব্যক্তিস্বরূপের মুদ্রাঙ্কিত, জীবন্ত ছন্দ তেমনই সার্বজন্য আবেগ আর অদ্বিতীয় অনুভূতির সঙ্কলন।"[৪৭]

এ-কথা কি তিনি নিজেই পরে ভুলে গেলেন, কারণ 'পূর্বলেখ'-'সন্দীপের চর'-এর পরে সুধীন্দ্রনাথ আর ভাবতে পারেন না (যেমন তিনি ভেবেছিলেন 'চোরাবালি' প্রসঙ্গে) যে, "অন্য উপায়ে [অর্থাৎ পূর্ব-কথিত ত্রুটিগুলি বর্জন করলে] তাৎপর্যের একাধিক স্তর একত্রে প্রকাশ পেত কিনা সন্দেহ।"[৪৮] বোধহয় বিষ্ণু দে-র কবিতায় "তাৎপর্যে"-র পরবর্তী বিস্তারে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যবোধের ঔদার্যও আহত হয়েছে। তাই তো 'চোরাবালি' প্রসঙ্গে যাঁর এতটা প্রশ্রয়— "গতানুগতিক পারিস্থিতির আশ্রয়েও [কবি] প্রাক্তন অনুভূতির পুনরাবৃত্তি করেন না, প্রাচীন ও সার্বজনীন প্রতীকগুলোকে অর্বাচীন আত্মোপলব্ধির কাজে লাগান ; এবং বিষ্ণু দের ক্ষেত্রেও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি—নদী ও বন, মেঘ ও পর্বত, সমুদ্র ও আকাশ, রাত্রি ও দিন চিরপরিচিত চিত্রকল্পাদির সাহায্যেই তাঁর স্বকীয় প্রেমানুভূতির অপূর্ব দ্বন্দ্বসমাস সূচিত হয়েছে। উপরন্তু

এ-জন্তে আমাদের ধন্তবাদই তাঁর প্রাপ্য, এখানে বিস্ময়প্রকাশের অবকাশ নেই; এবং মনোবিকলন-সম্বন্ধে যাঁদের যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানও আছে, তাঁরাই জানেন যে অল্পসংখ্যক ভাবচ্ছবিই যেহেতু অনন্ত বিভাবের বাহক, তাই স্বপ্নের তাৎপর্য-বিচারে মানস প্রতিমাদির বাহ্য রূপ নিতান্ত গৌণ, মুখ্য সেগুলোর অন্তঃসঙ্গতি ও অন্যোন্যসম্পর্ক।"[৪৯] —ষোল বছর বাদে চিঠিতে তিনিই অভিযোগ করেন: "কয়েকটি ভাবচ্ছবি-সম্বন্ধেও আমার অনুরূপ অভিযোগ আছে; এবং হাওয়া, আকাশ, পাহাড়, সমুদ্র, আশ্বিন, আষাঢ় ইত্যাদির পৌনঃপুন্য আমার কাছে যৎকিঞ্চিৎ ক্লান্তিকর ঠেকেছে।"

এ কি তবে সুধীন্দ্রনাথের প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, 'কাব্যের মুক্তি'তে যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন তাকে লঙ্ঘন করলেন এখানে? শঙ্খ ঘোষের মতো আমরাও কি প্রশ্ন করতে পারি, এ কি "কবির সাধ এবং সাধনার মধ্যবর্তী এমনি কোনো দ্বৈধ? দ্বিরাচার?"[৫০] আধুনিক ছন্দের মুক্তির সন্ধান যাঁরা প্রথম করেছিলেন, সুধীন্দ্রনাথ তাঁদের একজন—তাঁর প্রবন্ধাবলিই তার প্রমাণ। কিন্তু তাঁর নিজের কবিতার বেলায় এবং হয়তো তারই প্রভাবে পরবর্তীকালে অন্যের কাব্যবিচারেও "ছন্দকে মুক্ত দেখবার" আগ্রহ কেন লোপ পায়? "বাক্ছন্দ"-র কথা তিনি প্রবন্ধে এত বলেন, কিন্তু তাঁর নিজের কবিতায় সেই বাক্ছন্দের ব্যবহার এত সীমিত কেন? কিংবা বিষ্ণু দে-র কবিতায় বাক্ছন্দের বিচিত্র ব্যবহারে তিনি নিঃসাড় কেন? শঙ্খ ঘোষ এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন: "খুলে দেবার চেয়ে যেন তিনি আরো ঘন করে নিজেকেই বেঁধেছেন।"[৫১]

অর্থাৎ এই রক্ষণশীলতা শুধু কবিতারচনাতেই নয়, তাঁর কবিতাবিচারকেও আক্রান্ত করে। শৃঙ্খলা বা নিয়মের শাসন বিষয়েও তাঁর অতি-সতর্কতা বাংলা ভাষার বাক্রীতি বিষয়েও যেন তাঁকে শেষপর্যন্ত অচেতন করে রাখে। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ পত্র (৩১ নং) বোধহয় তারই উদাহরণ। মনেই হয় না, এটি 'কাব্যের মুক্তি'-র লেখকের রচনা—এ যেন নির্দয় বৈয়াকরণিকের খুঁতখুঁতে স্ব-ভাব।

উভয়ের কাব্যনন্দনের ব্যবধানের সম্পূর্ণ চিত্র বোধহয় পরিষ্কার হয়ে যায় এই চিঠিতেই। পরবর্তী অনেকের সমালোচনা, 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এর ছন্দ-বিষয়ে বা কাব্যকাঠামো-বিষয়ে, দেখা যাচ্ছে, তার অনেকগুলিরই উৎস

বা মিল সুধীন্দ্রনাথের চিঠিতে। তাই অরুণকুমার সরকারের বিরুদ্ধে বিষ্ণু দে-র সেই তীব্র শ্লেষাত্মক রচনাংশটি যেন সুধীন্দ্রনাথকে জবাব বলেই ধরে নিতে পারি। কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যাক তা থেকে :

"জীবনে যার আনাগোনা তার কবিতা ভালো-টে হলেও ঠিক ভালো হতে পারে না। নিদেন তার ছন্দব্যবহারে—ছাপার ভুল ছাড়াও দোষ থেকে যায়। কারণটা বোধহয় এই যে এ জাতের কবিতা পড়বার কবিতা, জীবন্ত ভাষার কথ্য ছন্দের স্মৃতি এর বাহন। লেখকের **ছন্দের কান** দুর্ভাগ্যবশত **যান্ত্রিক** বা মেট্রোনমিক, এজরা পাউণ্ড যাকে বলেছেন 'টম-টি-টম'-এর কান, যার লম্বা মিল তিনি পেয়েছেন 'বমে'। তাই শ্রীযুক্ত অরুণকুমার সরকার ট্রাফিক আইনের শাদা দাগ কেটে বলেন যে একাধিক এ-কার থাকলে নাকি সে লাইন অসহনীয়। 'মেলে না পার্বতী পরমেশ্বরে এ বেতাল গাজনে'—তাই তিনি পড়েন—'রেএ বেতাল গাজনে'। অথচ **বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ঝোঁক** এবং অর্থের মাত্রা আমার পাঠটিতেই মেলে, যার ফলে পার্বতী পরমেশ্বরের একতার পরে নিঃশ্বাস পড়ে আবার ওঠে এ বেতাল গাজনের এ-র বিশেষ ঝোঁকটিতে।...বস্তুত, জীবন্ত ভাষার কথ্য আবেগের যে ওঠাপড়ার ছন্দ আমরা অনেকে কবিতায় আনতে চাই, শুনতে চাই, সে ছন্দের পাঠ কারো কারো অভ্যাস নেই। বোধহয় জীবন বিষয়ে মানবিক আবেগ না থাকলে এ ছন্দের স্বভাব স্নায়ুতে শিকড় বাঁধে না।...যে কোন জীবন্ত ভাষায় কথা বলার চালের বাস্তবতাই কবিতার বাঁধা ছন্দকেও প্রাণময়তায় চালু করে তোলে—এটা আমরা পদ্যের বিকাশের ও নাট্যের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই বুঝেছি।"[৫২] অন্তত বিষ্ণু দে-র পক্ষ থেকে এই নন্দনপার্থক্যের কথা স্পষ্ট করে বলা হয়ে রইল এখানে। অবশ্য পরবর্তীকালে এই সুধীন্দ্রদত্তীয় ভ্রান্তির অত্যুৎসাহী অনুকরণকে ঠাট্টা করেছেন তিনি আরো তীব্র ভাষায়, ছড়ার তির্যকে :

"কবিতা সর্কার বা সরকার
সে শুধু চাটিই চেনে, ধাই ধপাধপ পদপাতে
কবিতার নাড়ি ছেঁড়ে, যতো ছেঁড়ে সেও ততো মাতে,
স্নায়ুতে চাটির স্মৃতি, আবাল্য সে টিকৃটিক্-বরদার
ছন্দ মিল গুনে মরে, জাবেদায় কবিতা-সর্কার।"

সঙ্গে পাদটীকা : "দরকার সরকার চার অক্ষর ব'লে ছন্দ ভুল, সুতরাং সর্কার লেখাই নিরাপদ।"[৫৩] খুবই মর্মভেদী ঠাট্টা সন্দেহ নেই।

১৯৫৩-র পর ১৯৫৬-তেও দেখা যাচ্ছে "আক্ষরিক ছন্দের অযুগ্মতা"-বিষয়ে তাঁর বৈয়াকরণিক কঠোরতা একটুও কমে নি। তাই অরুণকুমার সরকারকেই চিঠিতে লিখছেন : "বিষ্ণু দে মহাশয়ের 'যমও (যমো) নেয় না তাকে' আমার মতে ছন্দশৈথিল্যের পরিচায়ক, যা 'যমেও নেয় না তাকে' রূপ পেলে নির্দোষ হত।"[৫৪] দীপঙ্কর দাশগুপ্ত তার জবাবে লিখলেন, "বিষ্ণু দে-র 'যমও নেয় না তাকে' আমার একবারও 'ছন্দশৈথিল্যে'র পরিচায়ক বলে মনে হয় নি, বরং 'যমেও নেয় না তাকে' আমার কাছে কৃত্রিম, অনেকটা যেন আঙুলে কর গুনে লেখার মতো। 'যমও' শব্দটি আবেগের তীব্রতায় স্বভাবতই 'যম-ও' উচ্চারিত হয়ে থাকে, যিনি ছন্দ নিয়ে মাথা ঘামান না, আমার বিশ্বাস তিনিও কখনো এই পঙক্তির 'যমও' শব্দটিকে 'যমো' উচ্চারণ করবেন না। বিষ্ণু দে-কে ধন্যবাদ যে তিনি 'যমেও নেয় না তাকে' লেখেন নি।"[৫৫] সেই "চাটির স্মৃতি" বা দীপঙ্করবাবুর ভাষায় "কর গুনে লেখা"-র যান্ত্রিকতাই চাওয়া হচ্ছে এখানে, জীবন্ত ভাষার স্বাভাবিক ঝোঁককে নয়। শঙ্খ ঘোষও সুধীন্দ্রনাথের ছন্দ-বিষয়ক প্রবন্ধে তাঁর স্বাভাবিক বিনম্র সহকারে লিখছেন : "অযুগ্মতা এবং পর্ব-পর্বাঙ্গের প্রথাগত ধারণাগুলিকে যতো প্রত্যয়ের সঙ্গে সরিয়ে দেবার দরকার ছিল, সুধীন্দ্রনাথের রচনায় ততোটা প্রত্যয় দেখা যায় না।"[৫৬]

অবশ্য এই "ছন্দশাসন" এবং "শব্দের অতি-শৃঙ্খলা" যদিও "তাঁর ছন্দকে মুক্তির দিকে এগিয়ে যেতে দেয় না" এবং তাঁর মধ্যে একটা "প্রথাগত ধারণা"-র প্রশ্রয় পেতে থাকে, তবু এই শাসন ও শৃঙ্খলার অন্য একটি সৎ প্রেরণাকেও তো আমরা সত্যিই অস্বীকার করতে পারি না, সুধীন্দ্রনাথের কাব্যের দিক থেকে, হয়তো তাঁর কাব্যতত্ত্বের দিক থেকেও। মুক্তির মধ্যে যে স্বেচ্ছাচারের ভয় থাকে, ব্যক্তির বাধাহীন আত্মপ্রকাশের মধ্যে থাকে উচ্ছলতা, তা থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে এনে "নিয়মশাসিত এক ছন্দরূপে"র ধারণা পোষণ করতে চেয়েছেন কবিতায়, বা কবিতাবিচারে। শঙ্খ ঘোষ একে ব্যাখ্যা করেছেন, কবিতার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দের "নৈরাত্ম্যরীতি"র সাধনা। অন্য দিক থেকেও বলা

যায়, সমাজভাবনায় বা দর্শনচিন্তায় বা হয়তো ব্যক্তিগত জীবনযাপনেও কিছুটা, সুধীন্দ্রনাথ যে নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তাতে এই স্বায়ত্তশাসনই হতে পারছিল সম্ভবত তাঁর কবিতারচনার প্রধান প্রেরণা।

আর এ-দিকে 'পূর্বলেখ'-র পর থেকে—আরো সুনিশ্চিতভাবে 'সন্দীপের চর' ও 'অন্বিষ্ট' থেকে—বিষ্ণু দে সমাজ-আবেগের সঙ্গে নিজেকে অন্বিত করছিলেন ক্রমশই। কোনো আত্মশাসনের ছুঁতমার্গিতায় পরিবর্জন নয়, পরিগ্রহণের নিরন্তরতায় তিনি নৈরাত্মাবীতির পরোক্ষতাকে মিলিয়ে দিচ্ছিলেন সমাজকর্মের সক্রিয়তায় অংশগ্রহণের ও সহানুভূতির প্রত্যক্ষতার আবেগকে। তাঁর কবিতায় যেমন একই সঙ্গে গতির এবং স্থিতির ডায়ালেকটিকাল সম্পর্ক, তেমনি তাঁর ছন্দেও আছে দ্রুত চাল বদল, বৈপরীত্যে ও স্বরান্তরের পরিপূরকতায় ধ্বনির নতুন জটিলতা। 'কাব্যের মুক্তি'-তে গদ্যপদ্যের বিবাদভঞ্জন এবং বাক্‌ছন্দের যে কথা বলা হয়েছে, দেখা গেল তার পূর্ণ বিকাশ ঘটল সুধীন্দ্রনাথের নয়, তাঁর সহযোগী কনিষ্ঠ বন্ধুর ক্ষেত্রে।

শঙ্খ ঘোষ প্রশ্ন তুলেছেন, "বহির্বিচারে কেন মনে হয় যে, সুধীন্দ্রনাথ এই মুক্তির প্রতি ততোটা অনুরাগী নন যতো আগ্রহের চিহ্ন আছে তাঁর অন্যান্য বন্ধুর রচনায়?"[৫৭] "বহির্বিচারে" শব্দটি ব্যবহার করেন তিনি এই কারণে যে তাঁর কবিতার দ্বিতীয় যুগে, হয়তো 'সংবর্ত'-রই কোনো কোনো কবিতা থেকে, আরো বেশি 'দশমী'-র কয়েকটি কবিতাতে, শুরু হচ্ছিল "প্রত্যাশিত মুক্তির ভাবনা"[৫৮]—কিন্তু সেখানেও শেষপর্যন্ত চোখের দেখায় অন্তত তাঁর "প্যাটার্ন অনুরাগী মন"-ই প্রকাশ হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন জাগে, 'কাব্যের মুক্তি'-র লেখক অন্তত বন্ধুর কবিতায় যে মুক্তির দিক উন্মোচিত হচ্ছিল, তা কি বুঝতে পারেন নি? বিষ্ণু দে-র নন্দনদৃষ্টিতে গ্রহণ-বর্জনের ডায়ালেকটিক্সে সুধীন্দ্রনাথের যে স্থান আছে (এলিঅট-প্রসঙ্গেও যে কথা বলা যায়), তার তুলনায় সুধীন্দ্রনাথের নন্দনে দ্বান্দ্বিক কৌতুক কি তবে অনেক সঙ্কীর্ণ? তাই তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেন না, দুজনের "মত একেবারে বিপরীত এবং এ-দুইয়ের মধ্যে আপোষের চেষ্টাও হাস্যকর।" ভোলার কথা নয়, কিন্তু এই চিন্তা তাঁর কাব্যবোধকেও যেন গ্রাস করে। তা না হলে 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' প্রসঙ্গে তিনি বললেন কিভাবে:

"আমার শিক্ষা-দীক্ষায় দৈন্য ঘুচলেও, আমি 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এর প্রত্যেক 'তুমি'-কে চিনতে পারতুম কিনা সন্দেহ।"

আর এখানেই প্রকৃতপক্ষে সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে অপ্রতিরোধ্যভাবে আলাদা হয়ে যান। কেননা বিষ্ণু দে-র কবিতায় এই "তুমি"-র আবির্ভাব ও বিকাশই তাঁর কাব্যপ্রত্যয় ও উচ্চারণে পৌঁছবার ইতিহাসের একটি বড় চাবিকাঠি। প্রথম যুগে এলিঅটের প্রভাবকে অতিক্রম করে যখন 'পূর্বলেখ'-য় বাঁকবদল হল, রাজনীতির একটা টান এসে পড়ল তাঁর কবিতায়—স্বদেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ছায়াপাত ঘটল—ক্রমশ তাঁর কবিতাকে স্পর্শ করল স্বদেশের নানা সংঘাত, নানা ঘটনা ও দুর্ঘটনা, দুঃখ ও গৌরব—উপলব্ধির সেই জটিলতায় তাঁর কবিতায় এই মধ্যম পুরুষের আবির্ভাব। এই 'তুমি'-কেই তো আমরা পেয়েছি আরাগঁ বা এলুয়ার বা নেরুদার কবিতায়—সেই ঐতিহ্যেই, কিন্তু তাঁর কবিতার ইতিহাসের সূত্রে এবং বাংলাদেশের বাস্তবতার চাপে স্বতন্ত্রও বটে বিষ্ণু দে-র ঐ 'তুমি'। তাঁর কবিতায় যেমন অভিজ্ঞতার এক-একটি স্তর বাড়ছে, তেমনি এই 'তুমি'-ও পুষ্ট হচ্ছে। এই 'তুমি'-র মধ্য দিয়ে কবি তাঁর প্রেমিকার কাছে ব্যক্তিগত উচ্চারণ থেকে শুরু করে সামাজিক স্তরে জনগণের সঙ্গে সংযোগ পর্যন্ত প্রত্যেকটি পরতকে ছুঁতে চান। এই 'তুমি' কি কবির প্রেমিকা, না সহকর্মী, না পাঠকসমাজ, না কি বিপ্লবমুখী জনগণ? হয়তো কোথাও সবার প্রতি ইঙ্গিত, কোথাও-বা একটির ইঙ্গিত থেকে অনায়াসে চলে যাওয়া যায় অন্যের ইঙ্গিতে।

'তুমি'-র এই রহস্যময় ইঙ্গিতময় ব্যবহার কি না জানা সম্ভব সুধীন্দ্রনাথের? তাঁর কবিতাতেও তো ছিল 'তুমি'-র বিচিত্র বিন্যাস। কিন্তু বিষ্ণু দে-র কবিতায় এই 'তুমি'-র যে বিস্তার ঘটে—শুদ্ধ দার্শনিক ন্যায়-বিচারে নাকি অপাঙ্‌ক্তেয় এই রাজনৈতিক অর্থবিস্তার—তাতে সুধীন্দ্রনাথের কাব্যবুদ্ধি আর কাজ করতে চায় না। যিনি লিখতে পারেন "সহে না সহে না আর জনতার জঘন্য মিতালি"—সেই উক্তির পেছনে বিক্ষোভের বা অভিমানের যে সত্য ভিত্তিই থাক—তিনি কি করে সেই প্রতিমাকে অনুভব করবেন যেখানে বারবার ঘটে যায় 'তুমি'-র সঙ্গে উদ্বেল জনসত্তার সমীকরণ, কিংবা 'তুমি'-র মধ্যে লুকোনো থাকে জনগণ-মুক্তির কামনা? আর সেই কারণেই কি সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় 'তুমি'-কে

ছাড়িয়ে ক্রমশই 'আমি'-র এত প্রাদুর্ভাব? ফলে বিষ্ণু দে-র ঐ গ্রন্থটিরই 'প্রখর শাস্তি খর উজ্জ্বল' কবিতায় শেষাংশে সুধীন্দ্রনাথের পাঠাহত কপিটিতে দেখি "তোমারই লাবণ্য যে বিতরে" চরণটির পাশে অসহিষ্ণু প্রশ্নচিহ্ন।[৫৯]

আর সেই কারণেই পত্রালাপ আর যোগাযোগ আর কখনই আগের মতো ব্যাপক হতে পারে না—যেটুকু হয় বা যখন একটু বেশি করেই হয়, তখন সোচ্চার হয়ে ওঠে মতভেদ, এমনকি কখনো কখনো উগ্রভাবেই রাজনীতি সমাজনীতি এসে পড়ে। কিছুতেই স্বভাববিনয়ী সুধীন্দ্রনাথও গোপন করতে পারেন না তাঁর অসহিষ্ণুতাকে। আর বিষ্ণু দে বন্ধুর সঙ্গে মতভেদ গ্রাহ্য করে নিয়েই তাঁর সাহিত্যিক সাহচর্য প্রার্থনা করে চলেন। অবশ্য এ-সময়ে সুধীন্দ্রনাথের আলাপে-আচরণে-চিঠিতে সব সময়ই প্রকাশ্য হয়ে পড়ে সর্ব বিষয়ে অনীহা, কাব্যরচনা বা সাহিত্যালোচনাতে তো বটেই।

সঙ্গ-পরিবেশও রয়ে যায় অপরিবর্তিত। অবশ্য মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব সত্ত্বেও তিনি তাঁর মতেও কখনো সায় দিতে পারেন নি—কারণ স্পষ্টতই বলেন, তাঁর নিজের দৃষ্টি নেতিমূলক এবং বিকল্প সন্ধানের দায় তাঁর নেই।[৬০] তবু এম এন রায় এবং সেই সূত্রে কোনো কোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বৈঠকী আড্ডা ভালোই লাগে।

১৯৫৫-৫৬ সালে বিদেশেও পাড়ি দেন এই মানসিক শূন্যতায়। সাহিত্যিক কাজ বলতে তো শুধুঃ নতুন সংস্করণের ভূমিকা লেখা ও পুরোনো কবিতার সংস্কার ও অনুবাদ। মাঝে মাঝে "বহু কষ্টে" একটা-দুটো কবিতা। ১৯৫৬ সালে দেখা যাচ্ছে দেশে ফিরে পর পর কয়েকটি চিঠি লিখলেন। বন্ধুর সৃষ্টিশীল প্রাচুর্যের খবর পেয়ে তিনি মুগ্ধ।

অর্থাৎ যোগাযোগটা আসলে থাকেই। অন্যের সঙ্গেও বিষ্ণু দে-র কথা-বার্তায় দীর্ঘ সময় জুড়ে থাকে সুধীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ। অন্যের বিষয়ে চির-উৎসুক আলাপচারিতায় বারবার ঘুরে ফিরে আসে সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক কৌতুকে-রঙ্গে-অনুকম্পায় মেশানো কাহিনী। মাঝে মাঝে মনে হয় অন্তরঙ্গদের কাছে বিষ্ণু দে-র সবচেয়ে প্রিয় প্রসঙ্গ বোধহয় সুধীন্দ্রনাথ।

ঠিক তেমনি ব্যক্তিত্বের ভিন্নতায় পরোক্ষকথনে অভ্যস্ত এবং ব্যক্তিগত

অনুভূতি প্রকাশে সংযত নীরব সুধীন্দ্রনাথ হঠাৎ হঠাৎ বন্ধুজনের কাছে প্রকাশ করে ফেলেন বিষ্ণু দে সম্পর্কে অম্লান শ্রদ্ধা কিংবা স্ত্রী-র কাছে "অনেক দিনের চেনা ছেলেটি"-র বিষয়ে কিছুটা অসম্বৃত আবেগ।[৬১]

কিছুকাল পরে, শেষবারের মতো বিদেশে যাওয়ার কিছু আগে-পরে, মৃত্যুর আগে কয়েকটি বছর, সেই পুরোনো লুপ্ত সম্পর্কই যেন আবার প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। সুধীন্দ্রনাথের জীবনেও বুঝি কিছু কিছু পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। ১৯৫৭ সালে তিনি 'দশমী' প্রকাশ করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন ঠিক আগের বছর। নিঃসঙ্গ, ক্লান্ত, কিছুটা বিরক্ত সুধীন্দ্রনাথের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয়। কিছুটা কৌতুক। ছাত্রদের পড়াবার জন্য নিদারুণ পরিশ্রম করতে থাকেন—ছাত্রদের সঙ্গে সহজভাবে মেশেন প্রায় বন্ধুর মতো—বলেন, "সামনের বছর তোমাদের পড়ার অনেকটা করে রেখেছি।"[৬২]—কিংবা ১৯৫৮-তে শিকাগো থেকে বিভাগীয় প্রধান বুদ্ধদেব বসু-কে লেখেন, "যদি যাদবপুরে আমার ফেরা দরকার মনে করেন, তবে আমার দিকে কোনও বাধা থাকবে না, বরঞ্চ উৎসাহ আর গর্ব দেখবেন। কারণ আপনাদের সঙ্গে কাজ করে আনন্দ পেয়েছি প্রচুর; সে কাজ চালাতে পারলে আর কারও উপকার না হোক, আমার অনেক উপকার হবে।"[৬৩] এডওয়ার্ড শিল্‌স্‌ লেখেন তাই, "এই অভিজ্ঞতা খুবই মূল্যবান ওঁর কাছে।"[৬৪]

এই উৎসাহের ধাক্কায় তিনি আমন্ত্রণমাত্রই চলে আসেন উত্তর কলকাতায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বা যে-কোনো সঙ্ঘের ঘরে বা এমনকি ধুতিপাঞ্জাবি পরে দক্ষিণা 'মার্কস ক্লাবে'—এবং অনুরোধমাত্রই নিজের বা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন, তাঁর ঐ বিশিষ্ট ভঙ্গিতে।

এই নম্রতাতেই কি তাঁর ঔৎসুক্য ফিরে আসে জনতার মিতালিতে? একটু কি 'বাঙালি' বনে যান তিনি আবার?

যাদবপুরে সকালবেলার নির্জন স্টাফরুমে বন্ধুপত্নী এবং এখনকার সহকর্মী প্রণতি দে-র সঙ্গে হার্দ্য আলাপে যেন একটু স্নেহভরেই জিজ্ঞাসা করেন বন্ধু বিষ্ণুর কথা। খানিকটা হঠাৎই আবার দুই বন্ধুর যাতায়াতও শুরু

হয়ে যায়। বিষ্ণু দে মাঝে মাঝেই চলে যান রাসেল স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে। রাজেশ্বরীকে সেজে আসতে বলেন সুধীন্দ্রনাথ। কিংবা রেডিও-স্টেশন-ফেরৎ রাজেশ্বরীকে বলেন সকৌতুকে, "বিষ্ণু তোমার গান পছন্দ করে।" রাজেশ্বরীরও প্রাথমিক দূরত্ব ও বিরাগ কেটে যায়। মাঝে মাঝে অবশ্য মনে হয়, ক্লান্তিকে ছাপিয়ে সুধীন্দ্রনাথের এই প্রসন্ন কৌতুক কি আসন্ন বিদায়েরই ইঙ্গিত? তা না হলে তাঁর কথায় কেন মনে হবে বিষ্ণু দে-র, প্রবল বৈরাগ্যে মৃত্যুর জন্য তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন এ-বয়সেই? রাজেশ্বরীও উভয়ের পুরোনো বন্ধুত্বের আস্থায় বিষ্ণু দে-কে অনুরোধ করেন, সুধীনকে কিছু একটা বলতে, কারণ তিনি আজকাল প্রায় খালি পেটেই মদ্য পান করছেন। নিদারুণ অভিমানেই কি সুধীন্দ্রনাথ জবাব দেন, আই ড্রিঙ্ক টু বি ড্রাঙ্ক?

সুধীন্দ্রনাথ নিজেও আবার নেমে পড়েন প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে বন্ধুর বাড়িতে, একা কিংবা সস্ত্রীক, উচ্ছ্বসিত হন পরিবেশিত খাবারের স্বাদুতায়। দীর্ঘ বন্ধুত্বের স্মৃতি যেন আবার উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সামান্য সম্ভাষণে বা সামান্য আলাপেই। বিষ্ণু দে-র স্মৃতিতে যেমন সব সময়ই থাকে "বহু উষ্ণ দ্বিপ্রহর, বহু সন্ধ্যা, অনেক সকাল" মনে মনে বেয়ে চলা—তেমনি বন্ধুত্বের অনেক জোয়ার-ভাঁটা পার হয়ে মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন আগে লেখা চিঠিতে সুধীন্দ্রনাথ বন্ধুকে জানান: "যদি কোনও দিন উত্তাপ কমে, তবে আসবেন আমাদের এখানে। অনেক কাল দেখা হয় নি।"

১ উভয় পরিবারই খাঁটি কলকাত্তাই বটে, কিন্তু তফাতও আছে। বিষ্ণু দে বলেছেন, "আজীবন নিজেকে কলকাতার মানুষ জেনে এসেছি, যদিও সুহৃদ্বর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র মতো বংশগত কলকাত্তাই দাবি আমার সাজে না। কারণ পূর্বপুরুষেরা কলকাতার বাসিন্দা ছিলেন না।…" ('এই আমাদের কলকাতা'। 'সপ্তাহ', ৮ জানুয়ারি ১৯৭১)।

(ক) "সুধীন্দ্রনাথ যে দত্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তা অতি প্রাচীন ও বুনিয়াদী বংশ। কলকাতাতেই এঁদের আদি বাস।" (হরীন্দ্রনাথ দত্ত, 'দত্ত পরিবার, সুধীন্দ্রনাথ ও "পরিচয়"এর প্রকাশ'। 'উত্তরসূরী', শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৭)। বস্তুত ইংরেজ আমলের আগে, এখন যেখানে ফোর্ট উইলিয়াম সেখানে ওঁরা বাস করতেন

পুরুষানুক্রমে। ইংরেজরা ঐ জমি দখল করে পরিবর্তে চোরবাগান অঞ্চলে (মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে) জমি দেন। লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত ছিলেন সুধীন্দ্রনাথের প্রপিতামহ এবং লক্ষ্মীনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র দ্বারকানাথ ছিলেন সওদাগারি অফিসের মুৎসুদ্দি—ফলত ধনী। দ্বারকানাথই স্থানাভাবের কারণে চোরবাগানের পৈতৃক বাড়ি ও সুবিশাল যৌথ পরিবার ছেড়ে হাতিবাগানে জমি কেনেন ও বাড়ি করেন। দ্বারকানাথের সবচেয়ে কৃতী সন্তান হীরেন্দ্রনাথ। হীরেন্দ্র-নাথেরই জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। সুতরাং "বংশগত কলকাত্তাই" ওঁরা, সন্দেহ নেই।

(খ) বিষ্ণু দে-র প্রপিতামহ গঙ্গাধর দে বিশ্বাসই প্রথম কলকাতায় আসেন এবং পটলডাঙ্গায় (অর্থাৎ কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে, সংস্কৃত কলেজের উল্টো দিকে) বাড়ি করেন। তাঁর আগে এঁরা ছিলেন হাওড়া জেলার (তখনকার হিসেবে হুগলি জেলার) পাতিহাল গ্রামে (দ্র. সুবলচন্দ্র মিত্র, 'সরল বাঙ্গালা অভিধান')। গঙ্গাধর দে বিশ্বাসের দুই ছেলে: সুবিখ্যাত শ্যামাচরণ এবং বিমলাচরণ। বিমলাচরণেরই নাতি বিষ্ণু দে। ফলে "বংশগত কলকাত্তাই দাবি" ওঁদের সাজে না, ঠিকই।

২. হরীন্দ্রনাথ দত্ত, 'দত্ত পরিবার, সুধীন্দ্রনাথ ও "পরিচয়" এর প্রকাশ।' 'উত্তরসূরী', শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৭।

৩. 'কি করে লেখক হলুম'। 'অমৃত', ১১ জুলাই ১৯৬৯।

৪. ঐ।

৫. ঐ।

৬. এই কলকাতার কথা আমরা শুনেছি সুধীন্দ্রনাথ বা বিষ্ণু দে-র ইংরেজি প্রবন্ধে : Sudhindranath Datta, *Calcutta.* Encounter, June, 1957 ; Bishnu Dey, *My Calcutta* (1965), *In the Sun and the Rain,* PPH, 1972।

৭. বুদ্ধদেব বসু, 'আমার যৌবন'। এম সি সরকার, ১৯৭৬, পৃ ৬৩-৪।

৮. সূত্র ৩।

৯. এর আগেই তিনি ঘটনাটি লিখেছিলেন এইভাবে : "সেই সকাল-বেলার স্মৃতি আজও বেশ স্পষ্ট। পরে পরিচয়-গোষ্ঠী বলতে যে বন্ধুত্বের গোষ্ঠীটি গড়ে উঠল, তাতে বর্তমান লেখকই বোধহয় ছিল সবচেয়ে আন-কোরা, কাঁচা। আমার সুহৃৎশিক্ষক নীরেন রায়, পরিচয় বেরোবে বলে জয়াশায়ী সুধীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যান তাঁর কনিষ্ঠ পোষ্যকে।" ('মনীষার পৌরাণিক চরিত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু'। 'মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা', মনীষা, ১৯৬৭, পৃ ১৮)।

১০. পরে প্রবন্ধটি গ্রন্থস্থ হয় সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসংকলন 'স্বগত'-তে (ভারতী ভবন, বাং ১৩৪৫, পৃ ১৯-৩৯)।

১১. 'টমাস স্ট্যর্ণস এলিঅট'। 'এলোমেলো 'জীবন ও শিল্পসাহিত্য', ইস্ট এণ্ড কোম্পানী, [১৯৫৮], পৃ ৮০ ('এলিঅট প্রসঙ্গে' ২। 'জনসাধারণের রুচি', বিশ্ববাণী, ১৯৭৫, পৃ ১৭২)।

১২. "এদের মজলিশে ঠিক মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য পাইনি সে-কথা আমাকে মানতেই হবে। যেন একটু অধিকমাত্রায় সুচারু ও সমৃদ্ধ ও শোভমান, যেন আড্ডা নয়, আয়োজিত একটি অধিবেশন।" (বুদ্ধদেব বসু, 'আমার যৌবন'। সূত্র ৭। পৃ ৭০)।

'পরিচয়'-এর "মজলিশে"র ধরন সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু-র এই বিবরণের সঙ্গে হিরণকুমার সান্যাল বা শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ বা অন্য কারোর বিবরণই প্রায় মেলে না। এটা আসলে মফস্বল থেকে সদ্য আগত তরুণের আকস্মিক অভিজ্ঞতা হিসেবেই বিবেচ্য।

অনেক দিন পরে নীহাররঞ্জন রায়-ও স্মৃতিচারণা করে বলেন, "স্বর্গত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত মশায় যখন 'পরিচয়'-এর সূচনা করেন, তখন পত্রিকাটির পরিচয়-নাম-পৃষ্ঠায় ছাপা হত 'অভিজাত' পত্রিকা বলে।…সুধীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীরা কি নিজেদের 'Intellectual aristocrats' বলে নিজেদের উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন? আমি জানি নে; কিন্তু ঐ একটি বিশেষণ আমাকে ভীত ও সঙ্কুচিত করেছিল। যতদিন এই বিশেষণটি ছাপা হত নাম-পৃষ্ঠায় ততদিন আমি 'পরিচয়'-এর ধারে কাছে যেতে সাহস পেতাম না, 'পরিচয়' গোষ্ঠিরও নয়।" ('পরিচয়', নভেম্বর ১৯৭৬)।

১৩. হিরণকুমার সান্যাল লিখেছিলেন "[কল্লোলের] যুগের অর্বাচীনতম কবি বিষ্ণু দে।" ('পরিচয়-এর কুড়ি বছর'। 'পরিচয়', পৌষ ১৩৫৯)।

১৪. এই উদ্ধৃতিটি আছে হিরণকুমার সান্যালের 'পরিচয়-এর কুড়ি বছর' প্রবন্ধে ('পরিচয়', আষাঢ় ১৩৬১)।

১৫. হিরণকুমার সান্যালের অসমাপ্ত 'পরিচয়-এর কুড়ি বছর' ('পরিচয়'-এ ধারাবাহিকভাবে কিছুকাল প্রকাশিত হয়) বা সমাপ্ত কিন্তু সংক্ষিপ্ত 'পরিচয়-এর আড্ডা' ('দেশ', সাহিত্যসংখ্যা ১৩৮১) এবং শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের অপ্রকাশিত ডায়েরি (হিরণকুমার সান্যালের লেখায় আমরা তার কিছু কিছু উদ্ধৃতি পেয়েছি) ও 'নাইরোবি থেকে রবি' ('সপ্তাহ', ১৯৭৭-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে)।

১৬. হিরণকুমার সান্যাল, 'পরিচয়-এর আড্ডা'। 'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮১।

১৭. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, 'নাইরোবি থেকে রবি'। 'সপ্তাহ', ১৫ এপ্রিল ১৯৭৭।

১৮. সূত্র ৭, পৃ ৬৯-৭০।

১৯. বসন্তকুমার মল্লিকের এই দার্শনিক গাম্ভীর্যের এবং রূপকগ্রহণে অক্ষমতার কৌতুক-মিশ্রিত বিবরণ আছে বিষ্ণু দে-র প্রবন্ধ 'এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য'-র একটি গল্পে: "সোফার আরামে ডুবে গিয়ে তিনি ['পরিচয়'-এর আড্ডায় সদ্য আগত তরুণ ইংরেজ বা স্কট্ ম্যাগিলিভ্র—অক্সফোর্ড থেকে ডিগ্রি নিয়ে ম্যাঞ্চেস্টারের অধ্যাপক—লেবর দলের ছেলে] প্রায় শুয়ে পড়লেন কিন্তু আমাদের দার্শনিক মল্লিকদার বাজপাখির চোখ থেকে মুক্তি পেলেন না। মল্লিকদা যথারীতি প্রশ্ন করলেন রিয়ালিটির বিষয়ে ম্যাগিলিভ্রের কী মনোভাব। ম্যাগিলিভ্রের উত্তরে মল্লিকদা মোটেই খুশি হন নি, কারণ তর্ক হল না।" ('মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা'। মনীষা, ১৯৬৭, পৃ ৬৫-৬৬)। কিন্তু এই তর্কপটু বসন্তকুমারও, হিরণকুমার সান্যাল লিখেছেন, "সুধীনকে সব সময় বাগ মানাতে পারতেন না।" (সূত্র ১০)।

২০. 'মনীষার পৌরাণিক চরিত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু'। 'মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা', মনীষা, ১৯৬৭, পৃ ১৮-১৯।

২১. ঐ, পৃ ১৮। সুধীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু-র গভীর বন্ধুত্বের কথা বিষ্ণু দে অনেক বলেন। সুধীন্দ্রনাথ যেমন সত্যেন্দ্রনাথকে মনে করতেন তাঁর "best friend", তেমনি সত্যেন্দ্রনাথও সে-যুগে কলকাতায় থাকলেই 'পরিচয়'-এর আড্ডা এবং সুধীন্দ্রনাথের আকর্ষণে ছুটে যেতেন, কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের বাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতেন। 'পরিচয়'-এর আড্ডায় সত্যেন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের লেখায় পড়ছি: "অনেকের কাছে শুনেছি এবং 'পরিচয়'-এর আসরে দেখেছি সাহিত্য, দর্শন, সঙ্গীত, জ্যোতিষ, ভূবিদ্যা, রসায়ন যে কোনো বিষয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হলে মীমাংসা করে দিতেন সত্যেনবাবু। কিন্তু কথা বলতেন কম। কেবল হাসি বা ছোট্ট একটি মন্তব্যে অনেক কিছু বলা হয়ে যেত।" ('নাইরোবি থেকে রবি'। 'সপ্তাহ', ৪ মার্চ ১৯৭০)। বিষ্ণু দে এটাই আরো সুন্দর করে বলেন, "সেকালের পরিচয়ের আড্ডায় দেখেছি যে আপাতদৃষ্টিতে নিদ্রিতপ্রতীয়মান মননলোকের আজন্ম নেতা গরম তর্কের মধ্যে হঠাৎ একটা মন্তব্য বা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করে উঠতেন, যাতে বিতর্কটা মোড় ফিরত।" (সূত্র ২০, পৃ ২৫)। শ্যামলকৃষ্ণের ঐ লেখাতেই 'পরিচয়'-এর আড্ডার একটি দিনের খুব মজার বিবরণ আছে, "ভারতীয় চিত্রশিল্প" বিষয়ে যে কথোপকথনে যোগ দেন যামিনী রায়, সুধীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ।

সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র সম্পর্কও ছিল গভীর স্নেহ ও সৌহার্দ্যমূলক —'পরিচয়'-এর আড্ডার দিন থেকে শুরু করে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত সে সম্পর্ক ক্রমশই হয়েছে গভীর। বিষ্ণু দে যেমন মজা করে প্রথম আলাপের যুগের "চুলে বিলি কেটে" দেওয়ার গল্প করেন, তেমনি স্মরণ করেন বার বার তাঁর প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের স্নেহ এবং প্রশ্রয়।

২২. শেষ বাক্যটির ইঙ্গিত হল: এর কিছু পরেই বিষ্ণু দে নানা রকম অসুখে ভুগতে থাকেন। ১৯৩৫ সাল নাগাদ যখন তিনি রিপন কলেজে চাকরি নেন, তখন তিনি খুবই অসুস্থ। প্রণতি দে চিঠিতে লিখেছেন, "তখনই সব সময়ে পরিচয়-আড্ডায় যেতে পারেন নি।"

২৩. সম্ভবত ১৯৩৬ সালে অল্প কিছুকালের জন্য সঞ্জয় ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'পূর্বাশা'-র যে সাপ্তাহিক দীর্ঘায়তন সংস্করণ বেরোয়, তাতেই লেখাটি প্রকাশিত

হয়—কারণ বিষ্ণু দে জানিয়েছিলেন, "বোধহয় ১৯৩৬-এর বড় সাইজের 'পূর্বাশা'-তেই লেখাটি বেরোয়।" অনেক খোঁজ করেও ঐ সময়কার 'পূর্বাশা'-র কোনো কপি পাওয়া যায় নি। 'পূর্বাশা'-র সর্বকালের সহযোগী এবং বর্তমান সম্পাদক সত্যপ্রসন্ন দত্ত বলেছেন, সাপ্তাহিকে রিভিউ বেরোত, এটুকুই তাঁর কেবল মনে আছে—তাঁর কাছেও সাপ্তাহিক 'পূর্বাশা'-র কোনো কপি নেই।

২৪. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র যে পুস্তক-সংগ্রহ রক্ষিত আছে, তাতেই এই উপহৃত কপিটি পাওয়া যায়।

দান্তের ইতালীয় ভাষায় উদ্ধৃতিটির ইংরেজি অনুবাদ : "Poet, who guidest me, look if there be worth in me sufficient, before thou trust me to the arduous passage" (Inferno, Canto II, lines 10-12. The Carlyle-Wicksteed transl., Modern Library)। তা থেকে বাঙলা অনুবাদের দায়িত্ব আমাদের।

২৫. 'পশ্চিমবঙ্গ প্রগতি সম্মেলন' (১৯৭৬) উপলক্ষে 'প্রশ্নোত্তর'। 'কালান্তর', ২৬ এপ্রিল ১৯৭৬।

২৬. 'চিঠি'। 'পরিচয়', নভেম্বর ১৯৭৬। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও লিখেছেন, "'অভিজাত' 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশ হতে লাগল আধুনিক চিন্তায় সমুজ্জ্বল এমন রচনা যা ছড়িয়ে পড়ল আন্দামান থেকে দেওলি পর্যন্ত বহু বন্দীশালায় যেখানে মুক্তিযোদ্ধারা রুদ্ধ কক্ষে থেকেও দুনিয়ার নতুন হাওয়ার ছোঁয়াচ যেন পেলেন। কারাগারে বাঁধা থাকলেও তাঁদের বিপ্লবজিজ্ঞাসা পরিতৃপ্তিতে 'পরিচয়' প্রচুর সহায়তা করল।"

('পরিচয়'-এর ৪৫ বৎসর'। 'পরিচয়', শারদীয় সংখ্যা ১৯৭৬)।

২৭. শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, 'নাইরোবি থেকে রবি'। 'সপ্তাহ', ৩ জুন ১৯৭৭।

২৮. ঐ। 'সপ্তাহ', ২৭ মে ১৯৭৭।

২৯. হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'তরী হতে তীর'। মনীষা, ১৯৭৪, পৃ ৩৮০।

৩০. Edward Shils, *Introduction. The World of Twilight*, OUP, 1970, p. xvii।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "সুধীন্দ্রনাথের চিত্তবৃত্ত তখন [যুদ্ধের

সময়] খুব চঞ্চল, নিয়ত চিন্তাকুল ; কলকাতায় বিদ্বজ্জন মহলে মানবেন্দ্রনাথ রায়-এর উপস্থিতিও এনেছিল বিচিত্র প্রভাব ; অতুলচন্দ্র গুপ্ত, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মহারথী ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংস্থাকে সংবর্ধনা জানালেও 'পরিচয়'-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর কোনো কোনো সহযোগীর মনে যেন কিঞ্চিৎ অস্বস্তি।"—আর তার পাশে "প্রাজ্ঞ উপলব্ধি নিয়ে বিষ্ণু দে সাহিত্য-পরম্পরায় সেতুস্বরূপ হয়ে যেন রইলেন।" ('পরিচয়-এর ৪৫ বৎসর'। সূত্র ২৬)। হিরণকুমার সান্যাল লিখেছেন : " 'পরিচয়'-এর সভায় হীরেনবাবু সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনে একটি ইশতেহার লিখে নিয়ে তাতে স্বাক্ষর আদায়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু সুধীন রাজি হয় নি।" ('পরিচয়-এর কাহিনী'। 'পরিচয়', শারদীয় সংখ্যা ১৯৭৬)।

৩১. দ্রষ্টব্য সূত্র ২৪।

এমনকি ১৯৩৯-এও বিষ্ণু দে ইংরেজিতে 'স্বগত' প্রবন্ধগ্রন্থের রিভিউ লেখেন (সম্ভবত লখনৌ যুগের Progressive Literature Quarterly-তে প্রকাশিত হয়—খোঁজ পাওয়া যায় নি)—সে কি এই ঋণশোধের প্রেরণাতেই ?

৩২. বিষ্ণু দে এ-সময়েই (১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ এর মধ্যে) ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের অন্যতম সম্পাদক হন (অপর সম্পাদক : সুভাষ মুখোপাধ্যায়), হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত US পত্রিকায় লেখেন, কবিতা-পুস্তিকা রচনা করেন '২২শে জুন', ভারতীয় গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন'-র প্রচার করেন ইণ্ডো-সোভিয়েত জর্নালে, ভেরকরের এবং তাজিয়েফের ফ্যাসিস্ট-বিরোধী গল্প অনুবাদ করেন, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য বোম্বাই যান, এমনকি নাটকাভিনয়ের প্রযোজনাও করেন।

৩৩. বিষ্ণু দে 'সেক্সপিঅর ও বাংলা' প্রবন্ধে লিখেছেন, "স্বর্গত বন্ধুবর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তর্কে কখনো একমত হতে পারিনি যে ওথেলো-ই মহাকবির শ্রেষ্ঠ নাটক : যেহেতু, প্রেম নয়, ঈর্ষাই নাকি হচ্ছে মানুষের প্রেমের আদি প্রেরণাশক্তি।" ('মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা', সূত্র ২০, পৃ ২০৩)।

৩৪. প্রথমা স্ত্রী-র সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের মিটমাটের ব্যাপারে যামিনী রায় এত দূর আগ্রহী ছিলেন, কোনো এক স্টিমার-যাত্রায় তিনি নাকি ওঁদের

সঙ্গী পর্যন্ত হন। ছবি-র প্রতি সহানুভূতিবশত তিনি সমস্যা-সমাধানের অদ্ভুত অদ্ভুত প্রস্তাবও নাকি করতেন।

৩৫. যামিনী রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—বিষ্ণু দে তো বটেই—ইত্যাদি অনেক বন্ধুই সে সময়ে সুধীন্দ্রনাথের কোনো কোনো আচরণ পছন্দ করেন নি, এবং তাঁদের সঙ্গে এ-কারণেই সুধীন্দ্রনাথের সম্পর্ক সাময়িকভাবে ছিন্ন হয়ে যায়। শুধু একজন বোধহয় সুধীন্দ্রনাথকে কোনো দিনই ক্ষমা করতে পারেন নি—তিনি সত্যেন্দ্রনাথ বসু। সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল গভীর—কিন্তু প্রথমা স্ত্রী ত্যাগের ঘটনার পর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সম্ভবত ওঁদের আর কোনোদিন দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সত্যেন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন বাড়িতে এবং না পেয়ে শ্মশানগামী শোকযাত্রায়। "জগু বাজারের কাছে এসে হঠাৎ চমকে উঠলাম। ছুটে আসছেন বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। উস্কোখুস্কো চুল, উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। বললেন, তোমরা সুধীনকে একবার দাঁড় করাও, আমি দেখব।" (দিব্যেন্দু পালিত, 'আমাদের মাষ্টারমশাই সুধীন্দ্রনাথ'। 'কবিতা', আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৭)।

বিষ্ণু দে-ও, বলা বাহুল্য, সুধীন্দ্রনাথের এই আচরণে খুশি হন নি এবং তা কখনও কখনও প্রকাশ করেও থাকবেন। আর সুধীন্দ্রনাথও বন্ধুদের আচরণে খুঁজে পেয়েছেন সন্তসুলভ নীতিবাগীশতা।

৩৬. এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, কাকা অমরেন্দ্র-র প্রতি সুধীন্দ্রনাথের তীব্র আকর্ষণ (যা স্পষ্ট হয়েছে তাঁর ইংরেজিতে লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনী: '*The World of Twilight*-এর ১০ম ও ১১শ অধ্যায়ে) এবং কেউ কেউ ব্যাখ্যা করতে পারেন তাঁর উপর কাকা অমরেন্দ্র দত্ত-র প্রভাবও —যিনি ছিলেন প্রতিভাবান (দক্ষ নট এবং নাট্যকার) কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল, সুধীন্দ্রনাথের নিজেরই ভাষায়: "Once again, much less opprolerium appeared to attach to uncle Amar's uninhibited affairs with the leading actresses of the day than to his need for strong drinks ··" (সূত্র ৩০, p 33)।

পারিবারিক মহলেও সুধীন্দ্রনাথের জীবনযাপনের 'অসামাজিক' বিশৃঙ্খলা-র কথা যে উঠেছিল, তার প্রমাণ মামাতো ভাই প্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিকের

উক্তি : "তিনি হয়তো অনেক সময় প্রচলিত প্রথা মানেন নি, আমাদের চিরাভ্যস্ত সংস্কারকে উপেক্ষা করেছেন, এবং তাতে আমাদের মন সহজে সায় না দিলেও..." ইত্যাদি, "কিছুটা অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছি···"—অবশ্য সে কারণে তাঁর দাদার প্রতি শ্রদ্ধা "তিল পরিমাণও কমে নি।" ('আমাদের দাদা'। 'কবিতা', আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৭)।

৩৭. "ব্যক্তিগত নানা কারণে ক্রমে পত্রিকা চালানো সুধীন্দ্রের পক্ষে ভার-স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। সে বোঝা ঝেড়ে ফেলতে চাইল সম্ভবত ১৯৪৩ সালে। স্থির হল পত্রিকা বেচে দেওয়া অর্থাৎ হস্তান্তর হবে। প্রগতিবাদীদের তরফ থেকে আমিই তখন সুধীন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তা চালাই, ক্রেতা আরও অনেকে ছিল। সুধীন্দ্রের নিজের মুখেই শুনেছি প্রকাশক কুন্দভূষণ ভাদুড়ি পরামর্শ দিয়েছিলেন—'সুশোভনবাবুদেরই কাগজটা দেওয়া ভালো।' আর এক প্রার্থী ছিল হুমায়ুন কবীর, আর পরে শুনেছি বিমলচন্দ্র সিংহ-ও। ইণ্টারন্যাশনাল প্রকাশনা আমার মাধ্যমে 'পরিচয়' নিয়েছিল, ঠিক হল মাসে মাসে কিস্তিতে সুধীনকে দাম দিতে হবে, টাকাটাও যেত আমার হাত দিয়ে। ইণ্টারন্যাশনাল কমিউনিস্ট-অনুরাগীদের প্রতিষ্ঠান, সুতরাং প্রকারান্তরে 'পরিচয়' এসে পড়ল পার্টি'র আয়ত্তে।" ('চিঠি'। সূত্র ২৬)

"পরিচয়'-এর পরিচালনাভার সুধীনবাবু ৪৪ সালের শেষের দিকে [?] তুলে দেন ফ্যাশিস্ট-বিরোধী লেখক সংঘের হাতে—এ থেকে অন্তত অনুমান অমূলক নয় যে কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপ তাঁর অপছন্দ হলেও নিজের সাধের পত্রিকা আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেওয়াটা তাঁর উদার চিত্তবৃত্তি এবং আমাদের প্রতীতি বিষয়ে কথঞ্চিত শ্রদ্ধারই নিদর্শন!" (সূত্র ২৯, পৃ ৪৬৪)।

৩৮. সূত্র ২৭।

৩৯. নিরঞ্জন হালদার সম্পাদিত, 'সুধীন্দ্রনাথ'। রামায়ণী প্রকাশ ভবন, ১৯৭৫, পৃ ২৪৬।

৪০. সূত্র ২৯, পৃ ৪৪৩।

৪১. Malcolm Muggeridge, *Foreuard.* সূত্র ৩০। p. vi.।

মানবেন্দ্রনাথ রায় ও সুধীন্দ্রনাথের যোগাযোগের একটা ভালো ছবি পাওয়া যায় এলেন রায়-লিখিত 'সুধীন দত্ত ও এম. এন. রায়' প্রবন্ধে ('র‍্যাডিক্যাল

হিউম্যানিস্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত ইংরেজি প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ। সূত্র ৩৯, পৃ ২০১-২০৫)।

৪২. সূত্র ৩০। p. xx।

৪৩. ঠিক এই ধরনের কথা বিষ্ণু দে যে বলেছিলেন এ-সময়ে, সে-তথ্য পাওয়া যায় চিন্মোহন সেহানবীশের প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলন সম্পর্কিত একটি অপ্রকাশিত রিপোর্ট থেকে।

১৯৪৮-৪৯ সালেই সাহিত্যসংস্কৃতির ব্যাপারে অতিবামপন্থী বিভ্রান্তি তুঙ্গে উঠেছিল বটে—কিন্তু তার আগেই, বস্তুত ১৯৩৮ থেকেই প্রায়, প্রগতি সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনে একটা গোঁড়া মনোভাব সব সময় কাজ করেছে—এমনকি ফ্যাসিবিরোধী ঐক্যের যুগেও। ফ্রান্সের রজের গারোদি-র শিল্পসাহিত্য-বিষয়ক মতামতকে সমর্থন করে বিষ্ণু দে এই বিতর্কের প্রধান আক্রমণস্থল হয়েছিলেন অতিবামপন্থীদের হাতে।

৪৪. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 'পুনরুজ্জীবনের অভিনয়'। 'বহুরূপী', নবান্ন-স্মারকসংখ্যা ২, জুন ১৯৭০।

এই রচনাটিতে বিষ্ণু দে-র নাট্য-পরিচালনার একটি চমকপ্রদ বিবরণ আছে। এই অভিনয়কালে সুধীন্দ্রনাথ নাকি সে-সময়ের প্রবল রাজনৈতিক মতবিরোধ সত্ত্বেও উপস্থিত ছিলেন এবং অমিয় চক্রবর্তী নাকি টিকিট বিক্রি করেছিলেন বিদেশী, "বিদগ্ধ" সৈনিকদের মধ্যে। যামিনী রায়-ও যুক্ত ছিলেন সে-প্রচেষ্টায়। দেবীপ্রসাদ লিখেছেন, "[বিষ্ণু দে-র মতো] অমন স্বল্পভাষী এবং মৃদুভাষী ব্যক্তি আগাগোড়া একটা নাটকের মহড়া পরিচালনা করছেন—একথা ভাবা সত্যিই কঠিন। অথচ, পুনরুজ্জীবনের মহড়া প্রথম দিন থেকে তিনিই পরিচালনা করেছিলেন।···প্রত্যেকের সঙ্গেই অভিনয়ের খুঁটিনাটি পর্যন্ত আলোচনা করতেন। প্রত্যেককেই নির্দেশ দিতেন। কিন্তু এমন ভাবে যে, নির্দেশদানের কথা টের পাওয়া কঠিন।... [তিনি মনে করতেন] পুনরুজ্জীবনের কোথাওই ফালতু বলে কিছু নেই, তাই কিছুই ফেলা যেতে পারে না। ফাঁকও এতটুকু নেই, তাই কিছু গোঁজাও যাবে না। অতএব সব নির্ভর করছে অভিনয়ের সাফল্যের উপর।" প্রসঙ্গত, বলা যায়, ইয়েটসের নাটকের অনুবাদ 'পুনরুজ্জীবন' 'বহুরূপী'-র ঐ সংখ্যাতেই ছাপা হয়েছে।

৪৫. বুদ্ধদেব বসু-ও, যদিচ মৃত্যুর পরে, "সুধীন্দ্রনাথের অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি-পুস্তক" দেখে বুঝেছিলেন কিভাবে তিনি "দিনে দিনে অনলসভাবে অনবরত 'উদ্যমের ব্যথা' সহ্য করেছিলেন।" ('ভূমিকা'। 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ', নাভানা, ১৯৬২, পৃ-আট)।

৪৬. "চোরাবালি"। 'কুলায় ও কালপুরুষ', সিগনেট, বাং ১৩৬৪, পৃ ১১০।

৪৭. ঐ, পৃ ১০৯।

৪৮. ঐ, পৃ ১১০।

৪৯. ঐ, পৃ ৯৭।

৫০. শঙ্খ ঘোষ, 'ছন্দশাসন এবং সুধীন্দ্রনাথ'। 'ছন্দের বারান্দা', চিত্রক, ১৩৭৮, পৃ ৫৫।

৫১. ঐ, পৃ ৫০।

৫২. 'এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য'। সূত্র ২০, পৃ ৬১-২।

৫৩. 'সাতটি এপিগ্রাম'। 'কবিতা', পৌষ ১৩৬২।

৫৪. সুধীন্দ্রনাথের চিঠির দীর্ঘতর অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে: "আপনার [অরুণকুমার সরকারের] প্রথম প্রশ্নের জবাব এই যে পয়ারের প্রথম আট মাত্রার বণ্টন ২+৩+৩ হয় কিনা, সে-সম্বন্ধে আপনি শুধু সন্দিহান, কিন্তু আমি একেবারে নিশ্চিত যে তা হয় না, যেমন হয় না ৩+২+৩।...৩+২+৩ বিভাগের বহু দৃষ্টান্ত বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে মহাশয়ের সাম্প্রতিক কবিতায় তো রয়েছেই, এমনকি সম্ভবত 'পরিশেষ'-এর এক জায়গায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'মাধবী+লতা+বিতানে'...।...তৎসত্ত্বেও জ্ঞাতসারে আমি কখনও ও-জাতীয় মাত্রাবণ্টনের প্রশ্রয় আমার পদ্যে দিই নি...।...আসলে বাংলা উচ্চারণের সাধারণ বিধি মানলে, ওই পর্বের ২+৩+৩ ভাগ অসাধ্য; এবং কেবল 'পর্যন্ত' অর্থে নয়, 'ও'-র মানে যেখানে 'এবং' সেখানেও আমরা 'ও'-কে পূর্ববর্তী শব্দের সঙ্গে জুড়ে পড়ি।...সেইজন্যে বিষ্ণু দে মহাশয়ের 'যমও (যমো) নেয় না তাকে' আমার মতে ছন্দশৈথিল্যের পরিচায়ক, যা 'যমেও নেয় না তাকে' রূপ পেলে নির্দোষ হত...।" (অরুণকুমার সরকারকে ১১ জুন ১৯৫৬ তারিখে লিখিত চিঠি। 'শতভিষা', চৈত্র ১৩৭৩)।

৫৫. 'শতভিষা', চৈত্র ১৩৭৩। ৩৯ নং সূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থে ৫৪ ও ৫৫-র দুটি উদ্ধৃতিই আছে। পৃ ২২৬-৩০।

৫৬. সূত্র ৫০, পৃ ৫৪।

৫৭. ঐ।

৫৮. সুধীন্দ্রনাথের "পঙক্তি-একক প্রয়োগ" যে শৃঙ্খলার বদ্ধতা আনে, অন্তত তাঁর কবিতাতে প্রথম যুগে—দ্বিতীয় যুগে তা কিছুটা কাটতে থাকে, তাঁর কবিতাতেও যেন "বাক্‌স্পন্দের সঞ্চার" ঘটে। তার ভালো উদাহরণ 'সংবর্ত' কবিতাটিই। কিন্তু এখানেও মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্য নেই, বার বার যেন আবার বদ্ধতা বা প্যাটার্নের দিকেই ফিরে যান। শঙ্খ ঘোষের এই আলোচনাতেই আছে: "'দশমী'-র 'তীর্থ-পরিক্রমা' বা 'প্রত্যুত্তর' কবিতা দুটিতে পৌঁছে তাঁর মৃত্যুকে মনে হতে থাকে খুবই অকাল মৃত্যু, মনে হয় এই অসম্পন্ন পরীক্ষার একটি পুরো চেহারা হয়তো ধরতে পেতাম তাঁর পরিকল্পনায় আকস্মিক অবসান না ঘটলে।" (সূত্র ৫০, পৃ ৫২-৫৩)।

বিষ্ণু দে-ও দেখা যাচ্ছে, 'দশমী'-র কবিতাগুলির খুবই পক্ষপাতী তুলনামূলকভাবে—তা না হলে, তাঁর সংগৃহীত ও সম্পাদিত কাব্যসংকলন 'একালের কবিতা'য় সুধীন্দ্রনাথের নির্বাচিত মোট ৮টি কবিতার মধ্যে ৪টি-ই কেন নেওয়া হবে ক্ষীণকায় 'দশমী' থেকে?

৫৯. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত সুধীন্দ্রনাথ-সংগ্রহে 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এর যে কপিটি আছে, তাতে পেন্সিলের সাহায্যে দাগ দিয়ে পড়ার অজস্র চিহ্ন আছে সুধীন্দ্রনাথের।

৬০. "আমি 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ইণ্ডিয়া'-য় 'নিউ ওরিয়েন্টাশান' সম্পর্কে রায়ের দীর্ঘ প্রবন্ধ পড়েছি। স্বাভাবিকভাবে আমি তাঁর অধিকাংশ বক্তব্যের সাথে বহুলাংশে একমত। কিন্তু আপনি জানেন যে, আমার মানসিকতা একেবারেই নঙর্থক এবং আমি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করি যে, মার্কসবাদে কাজ হবে না। তবে আমার কোনো বিকল্প প্রস্তাব নেই।"

(এলেন রায়-কে লেখা চিঠির বঙ্গানুবাদ। সূত্র ৩৯, পৃ ২৬১। যদিও চিঠিটি ১৯৪৬ সালে সম্ভবত লেখা, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের এ-বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির কোনো পরিবর্তন হয় নি)।

৬১. এই সময়ে সুধীন্দ্রনাথের কিছুটা অন্তরঙ্গ ছিলেন আশীষ বর্মন। তিনি বিষ্ণু দে-রও ঘনিষ্ঠ। ফলে তাঁর মাধ্যমে অনেক সময় সংবাদকুশলাদির বিনিময় ঘটত। আশীষবাবুর কাছেই গল্প শুনেছি, কথাবার্তার মধ্যে বা শেষে হঠাৎ করে তিনি কিরকম বিষ্ণু দে-র খবর নিতেন কিংবা বিষ্ণু দে-র রাজনৈতিক মতামত বিষয়ে আপত্তি সত্ত্বেও প্রকাশ করতেন তাঁর কবিতার বিষয়ে আগ্রহ। সে-সময়ের আলাপের "সারাংশ" যেটুকু আশীষ বর্মন অনুরুদ্ধ হয়ে লিখে পাঠান—সুধীন্দ্রনাথের জবানিতে—তা হল এই : "মার্কসবাদই যদি বিষ্ণুর কাব্যশক্তির অফুরন্ত সৃষ্টিময়তার উৎস হয় তাহলে নিঃসন্দেহে সে-দর্শন তাঁর শিল্পীমনের পক্ষে এক মহৎ প্রেরণা। কিন্তু আমি যেহেতু মনুষ্য-প্রগতিতে আস্থা হারিয়েছি, তাই সম্ভবত ও-দর্শনে আমার মন চলে না। আবার এমনও হতে পারে যে হয়তো বা বিষ্ণু ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো জাত কবি—যাঁর মার্কসবাদ ছিল না—এবং তাই কোনো না কোনো জীবন-বোধের তাড়নায় ও প্রতীতির প্রেরণায় বিষ্ণু ভালো কবি হতেনই। অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রেরণার উৎস যদিও আমার কৌতূহল জাগায়, তা নিয়ে আমি তর্ক তুলতে গররাজি, তাঁর কবিতা আমায় ভাবায়, চমকায়, মাঝে মাঝে বিস্মিতও করে। এবং এটাই তাঁর কাব্য সম্বন্ধে আমার উৎসাহের মৌল হেতু।" (১০ জুন ১৯৭৭ তারিখে লিখিত চিঠি। সম্পূর্ণ স্মৃতিনির্ভর করে লেখা, সুতরাং আক্ষরিকভাবে এটা সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্য ধরলে ভুল হবে)। আশীষ বর্মন নিজে যোগ করেন, "অধিকন্তু সুধীন্দ্রনাথ—অন্তত শেষ বারো তেরো বছর, যে কালে আমি তাঁদের [সুধীন্দ্রনাথ ও রাজেশ্বরী দত্ত-র] অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হই—সত্যিই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে শিল্পসাহিত্য বিষয়ে শেষ কথা অচল। প্রাজ্ঞ ও অনুকম্পায়ী বিচার-বিশ্লেষণ শুধুমাত্র শিল্পসাহিত্যের একটা মান নির্ণয়ের সহায়ক…।" (ঐ)।

৬২. দিব্যেন্দু পালিত, ৩৫ নং সূত্রে উল্লিখিত প্রবন্ধ।

৬৩. 'পত্রগুচ্ছ'। 'কবিতা', আশ্বিন-পৌষ ১৩৬৭। ১৯ এপ্রিল ১৯৫৮-তে বুদ্ধদেব বসুকে লিখিত পত্র।

৬৪. সূত্র ৩০, p xxii।

সুধীন্দ্রনাথের চিঠি
বিষ্ণু দে-কে লেখা

১

১৩৯ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা

সবিনয় নিবেদন,

আপনার পত্র পেয়ে পরম প্রীত হলুম। আপনারা আমার কাছে Eliot-সম্বন্ধে একটা সারগর্ভ প্রবন্ধের প্রত্যাশা করেন, এটা নিশ্চয়ই গৌরবের বিষয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার অক্ষমতা আমার নিজের কাছে এতই স্পষ্ট যে আপনার অনুরোধে গর্বের চেয়ে ভয়ই বেশী অনুভব করছি। ইংরেজি সাহিত্যসম্বন্ধে কিছু নতুন কথা বলার চেষ্টা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র, বিশেষত বক্তব্য যদি T. S. Eliot হয়। ওই কবির লেখা আমার ভালো লাগে বলেই আমি ওর সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে পারি, এ-কথা ভাবা অনুচিত। নায়াগ্রা-প্রপাতের আওয়াজ আমার খুবই ভালো লাগে, কিন্তু তার অর্থ বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব। যদি Waste Land-এর ভূমিকাটা স্মরণ করে দেখেন, তা হলে মনে পড়বে, স্বয়ং কবির মতে সে-কবিতাটি বোঝার জন্যে কী পরিমাণের বিদ্যার প্রয়োজন। তাই আমার মনে হয়, Eliot-সম্বন্ধে বক্তৃতার জন্যে কোনো একজন সত্যিকারের বিদ্বানের [বিদ্বানের] কাছে আবেদন করলে আপনাদের উপকার হওয়া সম্ভব। নিজের বিদ্যার দৌড় কতদূর জানি বলেই, উক্ত প্রবন্ধ লেখার দুঃসাহসে এখনো প্রবৃত্ত হইনি।

এ তো গেলো বাজে কথা। আসল কথা হচ্ছে আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্যক। চিঠি লেখার কায়দায়, কথার ইঙ্গিতে, অস্পষ্ট পরিচয়ের যাদুতে আপনি আমাকে এতই কৌতুহলী [কৌতূহলী] করে তুলেছেন, যে এর পরে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ না-দেওয়াটা খুবই অন্যায় হবে। অতএব যদি অনুগ্রহ করে এদিকে

একদিন আসেন তাহলে আমার সম্বন্ধে আপনার জিজ্ঞাসাগুলো স্বমুখে চরিতার্থ করার সৌভাগ্য ঘটে। আপনার সম্বন্ধে আমার কৌতুহলও [কৌতূহলও] কিছু কম নয়। কাজেই সেটাও নিবারণ করতে পারবো। আমি সাধারণত সন্ধ্যার পরে বাড়ি থাকি। যদি খবর দিয়ে আসেন, তাহলে বাজে কাজের বিরল অত্যাচারের কোনো আশঙ্কাই থাকবেনা।

আমার হাতের লেখা খুবই খারাপ ; কিন্তু আজকে যতটা খারাপ দেখাচ্ছে ততটা নয় ; এর জন্য দায়ী আমার আহত অঙ্গুলি। ইতি ১৫শে বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৩৫

বশংবদ

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

১০ ই × ৬'৮ ই মাপের লম্বাটে খুব হাল্‌কা ছাই রঙের কাগজে, কালো কালিতে, মনে হয় দোয়াত-কলমে লেখা। চিঠির ওপরে ডান দিকে পুরোনো ছাঁদের হাতের লেখায় কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের ঠিকানা খোদাই করে ছাপানো। বাঁ পাশে বোধহয় বিষ্ণু দে-র হাতের লেখায় চিঠির প্রাপ্তির তারিখ লেখা আছে : 1928, 9th May।

২

139, CORNWALLIS STREET.
CALCUTTA

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি এইমাত্র পেলুম। আজই রাত্রে কালিঙপঙ যাচ্ছি, হাতে সময় বেশি নেই, কিন্তু উত্তর না দিয়ে থাকতে পারছিনা। আমি আপনার সমালোচনায় অসন্তুষ্ট হয়েছি এমন বিশ্বাস আপনার হলো কোথা থেকে। তবে তর্ক করা—অনেক সময় অন্যায় তর্ক করা, আমার অভ্যাস, তাই হয়তো অনেক ক্ষেত্রে জোর প্রতিবাদ করে থাকি, যদিও মনের মধ্যে সমালোচকের সঙ্গে একমত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর দেখিনা। উপরন্তু রুচির গরমিল থাকবেই। কিন্তু সেদিনে হয়তো আমার কথার মধ্যে একটু অত্যধিক

ঝাঁজ এসে পড়েছিলো, তার জন্যে ক্ষমা চাইছি। সে ঝাঁজ আপনাকে লক্ষ্য করে নয়, তার কারণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং personal। আপনার মত আমি সব সময়েই শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতে চাই, কারণ আপনার বুদ্ধির উপর আমার আস্থা আছে।

যাক সে কথা। যেটা আসল বক্তব্য তা হচ্ছে এই যে খাতিরে পড়ে লেখা ছাপতে "পরিচয়" বাধ্য। আমাদের কাগজ এখনো এত অপরিণত-বয়স্ক যে আশপাশের পাঁচজনের শুভেচ্ছা ব্যতিরেকে তার পরিপুষ্টি হওয়া অসম্ভব। তবে এটুকু চেষ্টা করা উচিত যে লেখাগুলো যেন নিতান্ত বাজে না-হয়। অদর্শের [আদর্শের] দিক দিয়ে এটা খুব বড় কথা হলোনা। কিন্তু compromise ছাড়া যখন জগৎই অচল, তখন পরিচয়ের কর্তৃপক্ষকে কি দোষ দেওয়া যায়।

কিন্তু এইখানে একটা কথা আপনাকে জানাতেই হচ্ছে। আপনার কবিতা দুটি, অন্তত, আমি উপরোধে পড়ে ছাপিনি। ও-দুটি আমার ভালো লেগেছিলো, এবং ওদুটির মৌলিকতা এতই পরিস্ফুট বলে বিবেচনা করেছিলুম যে অল্প দু-একটি ত্রুটি (আমার মতে) সত্ত্বেও ওদুটিকে সাদরে গ্রহণ করি। এ-কথা আপনাকে অনেক বার বলেছি যে মৌলিকতার ও experiment-এর দিক থেকে আপনার কবিতা দুটিই পরিচয়ের প্রথম সংখ্যার শ্রেষ্ঠ কবিতা। তবে সম্পাদনের দিক থেকে ওদুটিকে আমি খুব উঁচুতে স্থান দিতে প্রস্তুত নই। কিন্তু এখানেও রুচির কথা উঠছে, কারণ আমার দু-এক জন কাব্যবিলাসী বন্ধু আপনার কবিতা দুটিকে অত্যুৎকৃষ্ট বলে বিবেচনা করেন। আমার মামার বাড়িতে ও সম্বন্ধে কি বলেছিলুম, তা মনে করা এখন শক্ত। কিন্তু খাতিরে পড়ে ছেপেছি এমন কথা বলে থাকা সম্ভব নয়। মাতুলালয়ে একজন আপনার লেখার নিন্দা করেছিলেন মনে আছে, সে-সময়ে আমি স্বভাবের বশে তাঁর সঙ্গে খুব জোরেই তর্ক করেছিলুম। কাজেই instead of crying your poems down,

it is more likely that I overpraised them। সেই তর্কেরই কোনো একটা শাখার অতিরঞ্জিত সংস্করণ আপনার কাছে পৌঁছে থাকবে। ও-দুটির সম্বন্ধে আমার মত সত্যই ভালো, আশা করি এ-কথা বিশ্বাস করবেন।

আমার প্রবন্ধের প্রশংসা করেছেন বলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভাববেননা এই ধন্যবাদ প্রথাসিদ্ধ সৌজন্যের ফল। আপনার প্রশংসাকে আমি সত্যই মূল্যবান মনে করি।

এইখানে থামছি। পত্রখানা খুব এলোমেলো হলো, কিন্তু তার জন্যে কেবল আমি একলা দায়ী নই। পরিচয় সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে একদিন মন খুলে আলোচনা করতে চাই। ফিরে এসে জানাবো। সেদিনে দেখবেন আপনার আমার মতে কতখানি মিল রয়েছে। ইতি

ভবদীয়

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

৬.৯ ই—৭.১ ই প্রায় চৌকো মাপের চার-ভাজ করা ধূসর খুব মোটা অ্যাণ্টিক কাগজে সামনে-পিছনে এবং ভেতরের পৃষ্ঠায় খুলে লম্বালম্বি, এই মোট ৩ পৃষ্ঠায় লেখা। ডান দিকে ইংরেজি ছাপা-হরফে ঠিকানা খোদাই করা। চিঠিতে তারিখ নেই। পড়ে বোঝা যায়, 'পরিচয়' প্রথম প্রকাশের অল্প পরেই লেখা। 'পরিচয়' প্রথম প্রকাশের তারিখ: শ্রাবণ ১৩৩৮ (জুলাই বা অগস্ট ১৯৩১)। উল্লিখিত কবিতা দুটি হল বিষ্ণু দে-র 'অর্ধনারীশ্বর' এবং 'বজ্রপাণি' ('উর্বশী ও আর্টেমিস' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)। প্রশংসিত প্রবন্ধটি সম্ভবত সুধীন্দ্রনাথের 'কাব্যের মুক্তি'।

৩

পরিচয়
ত্রৈমাসিক পত্রিকা

STEPHEN HOUSE
ROOM NO 17
4 & 5, DALHOUSIE SQ
CALCUTTA

প্রিয়বরেষু,

আসচে শুক্রবার ২০শে নভেম্বর ৬টার সময় পরিচয়ের একটা বৈঠক বসলে ভালো হয়। আমার বাড়িতে হওয়াই বোধহয় ভালো। আপনার আসা চাইই চাই।

আশা করি ভালো আছেন। ইতি ১৭/১১/৩১

ভবদীয়
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সাদা পোস্টকার্ড—'পরিচয়'-এর নামলিপি ও ঠিকানা ছাপানো। উল্টো দিকে বিষ্ণু দে-র তৎকালীন ঠিকানাটিও পাওয়া যায়: ১০৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা। এই চিঠিটি এবং পরের ৩টি চিঠিই বেগনি কালিতে দোয়াত-কলমে লেখা।

৪

পরিচয়
Parichaya
ত্রৈমাসিক পত্রিকা

STEPHEN HOUSE
ROOM NO. 17
5, DALHOUSIE SQ
CALCUTTA

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠিখানির জবাব দিইনি, কারণ আশা করেছিলুম যে অন্তত গত শুক্রবার আপনার সাক্ষাৎ পাবোই। সে-সৌভাগ্য যখন ঘটলোনা তখন পত্রদ্বারাই আপনার আগামী কর্ত্তব্যটুকু জানিয়ে রাখছি। আসছে বারে 'পরিচয়ে' আপনাকে অলডস্ হাক্সলির "The Cicades" and "Music at Night" এই বই দুখানার সমালোচনা লিখতে হবে। শেষোক্ত কেতাব আপনার আছে বলে শুনেছি, তাই প্রথমটি পরিচয়ের প্রথম সংখ্যার সঙ্গে পাঠালুম। লেখা পেতে দেরি হলে চলবে না—, সম্ভব হয়তো শুক্রবার রচনাটি

নিয়ে আড্ডায় আসবেন। আমার ওখানেই বৈঠক হবে। আপনার উপস্থিত থাকা চাই।

আশা করি ভালো আছেন। ইতি ১ ডিসেম্বর, ১৯৩১

ভবদীয়

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

'পরিচয়' নামাঙ্কিত প্যাডের সাদা কাগজে (৯ই × ৬·৫ই) লেখা। যে বই দুখানার সমালোচনার কথা বলা হয়েছে, তা বের হয় 'পরিচয়' এর ১ বর্ষ ৩ সংখ্যায় (মাঘ, ১৩৩৮)—অবশ্য এর সঙ্গে আরো একটি বই সমালোচিত হয়—হাক্সলির-ই লেখা 'The World of Light'।

৫

প্রিয়বরেষু,

আপনার দেখা পাবার জন্যে আমি এত ব্যস্ত যে আপনি এসে ফিরে গেছেন শুনে নিজেকে সত্যই দুর্ভাগ্যবান মনে করছি।

আজ বাড়ি ফেরার পথে একটু কাজ আছে, সেরে পৌঁছতে ৭॥০টা হবে। আশা করি ওই সময়ে আসতে আপনার অসুবিধা হবেনা। আপনার প্রতীক্ষায় থাকবো। ইতি ৭/১২/৩১

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৭ ই × ৪·৫ ই টুকরো সাদা কাগজে বেগনি কালিতে লেখা—হাতের লেখা গোটা গোটা বড়—স্পষ্টত রাবীন্দ্রিক।

৬

পরিচয়
Parichaya
ত্রৈমাসিক পত্রিকা

STEPHEN HOUSE
ROOM NO. 17
5, DALHOUSIE SQ
CALCUTTA

প্রিয়বরেষু,

আপনাকে চিঠি লিখতে বসে মনে পড়লো যে, আপনার 'তেপাটি'র কপিগুলো সঙ্গে আনতে ভুলে গেছি। ওগুলির মধ্যে কয়েকটি আমার বড় ভালো লেগেছে, কিন্তু একটা দুটো forced বলে মনে

হলো। অবশ্য আজকে জগতের আর ঠিক "তেপাটি" লেখার মতো মনোভাব নেই, কাজেই ওই ধরণের শ্লোক কতকটা পরিমাণের কৃত্রিম হতে বাধ্য। আমি যেহেতু সাহিত্যের অবৈকল্য আর জীবনের সত্যতা সমপর্য্যায়ের বলে ভাবিনা, তাই আমার পক্ষে কবিতার formalness দোষের নয়। কিন্তু আপনার ধর্ম্ম তো অন্যধরণের। সে যাই হোক, বই বার করবেন কিনা এবিষয়ে মুখে আলোচনা হলেই ভালো। তাই এখানে সে-প্রসঙ্গে মৌন রইলুম।

হেমবাবুর (?) অনুবাদ খুব ভালো না-হলেও পরিচয়ে তার স্থান অতি অবশ্যই হবে। কিন্তু এবারে জায়গা দিতে পারবো কিনা এখন থেকে বলতে পারিনা। তিনি যদি ব্যস্ত না-হন তাহলে লেখাগুলি আমার কাছে রেখে দিই, এবার না-হয় আসচে বার ছাপাবো। ইতিমধ্যে তাঁর অনুবাদগুলি দেখবার জন্যে কৌতুহল [কৌতূহল] হচ্ছে।

আপনার অনুবাদের গোটাকয়েক আমার ভালো লেগেছে, তা পূর্ব্বেই জানিয়েছি। এবারে তার মধ্যে থেকে বাছাই করতে চাইনা, আগামী বারে গোটাকয়েক পছন্দ করে নেবো।

আশা করি ভালো আছেন। কাল আপনি এলে ভালো হতো। দু তিন জন নতুন লোক এসেছিলেন। আসচে শুক্রবার আমার বাড়িতেই বৈঠক হবে। আপনার আসা চাই। ইতি ১২ মার্চ্চ ১৯৩১

নীরেনকে আপনার চিঠি দেখিয়েছি।

ভবদীয়
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৪ নং চিঠির মতোই কাগজ। উভয় পৃষ্ঠাতেই বড় বড় করে লেখা। 'তেপাটি' শব্দটি বিষ্ণু দে ফরাসী কাব্যবন্ধ Triolet-এর অনুবাদ হিসেবে লেখেন—প্রথম চৌধুরীর অনুসরণে। ১৩৩৩-এ রচিত 'কবিকিশোর'-এর ট্রিওলেটটির ('চোরাবালি' গ্রন্থে আছে) কথাই বোধহয় বলা হয়েছে এখানে। যে বই বার করার কথা উঠেছে সেটি নিশ্চয়ই 'উর্বশী ও আর্টেমিস' (প্রকাশকাল: ১৩৩৯)।
হেমবাবু—হেমচন্দ্র বাগচী। নাম বা পদবী মনে পড়ছিল না বলে জিজ্ঞাসার চিহ্ন। হেমচন্দ্র বাগচীর দুটি অনুবাদ ঐ সময়ে 'পরিচয়'-এ ছাপা হয় (কার্তিক, ১৩৩৮): ১. 'শ্যামপাহাড়ে' ("জে ই ফ্লেকারের অনুভাবে"), ২. 'পতঙ্গ' ("ওয়াল্টার ডি লা মেয়ারের অনুভাবে")।
নীরেন—নীরেন্দ্রনাথ রায়, 'পরিচয়'-এর আদি প্রতিষ্ঠাতাদের একজন।

৭

প্রিয়বরেষু,

আগামী শুক্রবারের বৈঠক হুমায়ুন কবির তাঁর বাড়িতে করতে চান। ঠিকানা ১২৭ নং নিউ সার্কুলার রোড, ব্যারিষ্টার এস্, এন্, ব্যানার্জ্জির বাড়ির পাশে। আপনি না-গেলে তিনি দুঃখিত হবেন। ইতি ২১/৮/৩৪

ভবদীয়
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৭টি এবং পরের দুটি চিঠিই পোস্টকার্ডে লেখা।

৮

১৩৯ নং কর্ণ্‌ওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

প্রিয়বরেষু,

পুস্তকপরিচয়ের জন্যে পরিচয়ের মাঘ সংখ্যা আট্‌কে আছে; আপনার কাছ থেকে দুটি লেখা আশা করছি। একটি আপনার নিজের, কবিতার বইগুলোর রিভিউ; অন্যটি আপনার বন্ধুর, ইংরেজি ও ফরাসী উপন্যাসের সমালোচনা। আর দেরি করলে অনেক লোকনিন্দা শুনতে হবে। অতএব যদি অবিলম্বে লেখা দুটিকে আমার এখানে কিম্বা পরিচয়-অফিসে পাঠান, তাহলে বিশেষ উপকৃত হবো। সে-লেখা দুটি চাইই, কারণ তাদের জন্যে স্থান খালি রেখেছি।

আশা করি ভালো আছেন। সম্ভব হলে একদিন এদিকে আসবেন, ধরুন সাম্‌নে শুক্রবার। ইতি ৮ জানুয়ারি ১৯৩৫

ভবদীয়
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

"নিজের" লেখা—বিষ্ণু দে-কৃত রিভিউ: W. Empson, G. Barker, Marianne Moore ও Cecil Day Lewis-এর কবিতাগ্রন্থের সমালোচনা (বৈশাখ, ১৩৪৩) এবং W. H. Auden and J. T. Garrett, Michael Roberts, J. M. Parsons ও John Lane সম্পাদিত চারটি কাব্যসঙ্কলনের সমালোচনা (শ্রাবণ, ১৩৪৩)। উভয় সমালোচনাই আছে 'সাহিত্যের দেশবিদেশ' গ্রন্থে।

"আপনার বন্ধু"—জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, তখন লিখতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। কবি, সুরকার, বিষ্ণু দে-র এম. এ. ক্লাসের সহপাঠী বন্ধু। তার ফরাসী উপন্যাসের সমালোচনা (André Malraux-র 'La Condition Humaine' বা 'Storm in Shanghai')—বেরোয় বৈশাখ ১৩৪২ সংখ্যায়।

এই চিঠি থেকে দেখা যাচ্ছে ঠিকানা পালটেছে বিষ্ণু দে-র: [illegible] বালিগঞ্জ।

৯

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে খুসি হয়েছি। কিন্তু আপনার অসুস্থতার খবরটা ভালো নয়। আশা করি এত দিনে সেরে উঠেছেন।

লজ্জার সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে পরিচয় প্রকাশের আরো তিন-চার দিন দেরি আছে। এই বিলম্বের জন্যে দায়ী কাউকেই করা যায় না, দোষ ঘটনাচক্রের। আপনার শিখণ্ডী এবারে যাচ্ছে।

নানা হাঙ্গামে দিন কাটছে। কাজেই পড়াশুনো একদম বন্ধ, লেখাও। ঈডিথ্ সিট্ওয়েলের বইখানার পরে আর কিছুই বিশেষ পড়িনি। সমালোচকেরা যদিও তাঁর প্রতি বিরূপ, তবু বইখানা আমার ভালোই লেগেছে, অন্তত নিউ বেয়ারিং-এর চেয়ে। পাউণ্ড্ আর এলিয়ট্-এর উপর প্রবন্ধ দুটো সত্যিই চমৎকার।

সুবিধা পেলে একদিন আসবেন! ইতি ২৫ জানুয়ারি ১৯৩৫

ভবদীয়

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

১৯৩৫-এর জানুয়ারিতে বিষ্ণু দে খুব অসুস্থ হন—"tonsils-এ Staphilostreptococcus infection থেকে পরে rheumatic fever হয়"।

"আপনার শিখণ্ডী"—'চোরাবালি' গ্রন্থের 'শিখণ্ডীর গান' ('পরিচয়', মাঘ ১৩৪১)।

ঈডিথ সিটওয়েলের দুটি সমালোচনাগ্রন্থ ইতিপূর্বে বেরিয়েছে: 'Poetry and Criticism' (১৯২৫) এবং 'Aspects of Modern Poetry' (১৯৩৪)—সম্ভবত শেষোক্ত গ্রন্থটিই এখানে উল্লিখিত।

"নিউ বেয়ারিং"—F. R. Leavis-এর 'New Bearings in English Poetry' (১৯৩২)।

BHARATI BHAVAN
Booksellers & Publishers

24-5A, COLLEGE STREET,
Calcutta,.........193

প্রিয়বরেষু,

আপনার লেখা পাঠালুম। দেরি হলো ব'লে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমার সবুর সইবে না। শুক্রবার যেন ফেরৎ পাই। সেই উপন্যাস-এর সমালোচনা কি হলো? এই লেখকের হাতে পাঠালে উপকৃত হই। নতুবা শুক্রবার নিশ্চয় আসবেন। আমার বাড়িতে পরিচয়। ইতি ১৫/৩

ভবদীয়
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ছাপা নাম-ঠিকানা সহ প্যাডের কাগজ (৯ই × ৫·৫ ই)। পেন্সিলে খুব ব্যস্তভাবে লেখা। দিন-মাসের উল্লেখ আছে, সাল দেওয়া নেই। ৮নং চিঠিটির সূত্রে এটিকে সম্পূর্ণ অনুমানে একই বছরে রাখা হল। চিঠিটির অর্থ ঠিক বোঝা যায় না। বিষ্ণু দে-ও লেখেন, "মনে করতে পারছি না।"

১১

১৩৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিয়বরেষু,

এত ব্যস্ত ছিলুম একটা লেখা নিয়ে যে আপনার চিঠির উত্তর সময়মতো দিতে পারিনি। অপরাধ নেবেন না।

আপনার বন্ধুটির লেখা পড়লুম। শেষের দুটি কবিতা ভালো লেগেছে। ও দুটিকে ছাপতে পারি। কিন্তু প্রথম দুটির পুনর্লিখন বোধহয় আবশ্যক।

আপনার শরীর কেমন? আশা করি পুরীর হাওয়ায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ফিরবেন। আপনার অস্বাস্থ্য সত্যিই খারাপ লাগে।

আমাদের এখানে গরম ছাড়া অন্য কোনো খবর নেই। পরিচায়ের [পরিচয়ের] আড্ডা ঢিমে তালে চলছে, এক ধূর্জ্জটীই [ধূর্জ্জটিই]

অচল হতে দেয়না। লক্ষ্ণৌ-এর তুলনায় কলকাতা নাকি দার্জ্জিলিং সদৃশ, এই বোধহয় তার উৎসাহের কারণ।

নতুন বই-এর বিশেষ কোনো খবর রাখিনা। তবে ফক্‌নার-এর Pylon পড়ে নিরাশ হয়েছি, মল্‌রো-র Le Temps du Mepris পড়েও। কিন্তু Giraudoux-র Combat avec L'auge সত্যিই ভালো।

কবে কলকাতায় ফিরছেন? ইতি ২ জুন ৩৫

ভবদীয় শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৬'৭ ইঁ × ৫ ইঁ মাপের চার-ভাঁজ-করা নীলাভ কাগজ, প্রথম পৃষ্ঠার মাথায় গাঢ় নীল রঙে এই চিঠির ঠিকানার একটি খোদাই-করা। এখানেও "আপনার বন্ধু" বলতে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রকে বোঝানো হয়েছে। ধূর্জটি—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। চিঠি লেখা হয়েছে পুরীর ঠিকানায়। তিনি যে অসুস্থতার (Biliary Colic) কারণে ডাক্তারদের পরামর্শে পুরী যান।

১১

১৩৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

প্রিয়বরেষু,

শোনা যায় যে পূজোর সময়ে বাঙালীর মন এমন পারত্রিক হয়ে ওঠে যে অপণ্য কিন্‌তেও সে দ্বিধা করেনা। কথাটার মধ্যে কিছু সত্য থাকলেও 'অর্কেষ্ট্রা'র এক-আধ কপি এ-বাজারে বিক্রি হওয়া আশ্চর্য্য নয়। তাই বই পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার প্রতিশ্রুতিটা মনে করিয়ে দিচ্ছি। আগামী শনিবারের মধ্যেও যদি লেখাটি দিতে পারেন, তবে আশ্বিনের পূর্ব্বাশায় যেতে পারে। অবশ্য এই সময়টুকুকে সংক্ষিপ্ত ছাড়া অন্য বিশেষণে ভূষিত করা শক্ত। কিন্তু আমার বইটাও বড় নয়, এবং কবিতাগুলোর দোষ এত বেশি ও স্পষ্ট যে তার আবিষ্কারে আপনাকে কালক্ষেপ করতে হবেনা।

অতএব যদি সম্ভব হয় তবে এই হপ্তার মধ্যেই সমালোচনা শেষ করবেন। কিন্তু অন্য কাজের ভিড় থাকলে তাড়া করার দরকার নেই।

বলাই বাহুল্য আমি আপনার কাব্যবিবেচনাকে শ্রদ্ধা করি; আপনার বিচার থেকে আত্মসংশোধন করতে পারবো, এই আশাতেই আপনাকে সমালোচনা করার জন্যে অনুরোধ করছি। সুতরাং যদি লেখেন তবে আমাকে ছেড়ে কথা কইবেন না। এবং লিখলে রচনাটিকে আমার কাছেই পাঠাবেন, আমি পুস্তকসহ সেটিকে পূর্ব্বাশার কর্ত্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছে দেবো।

আশা করি আপনি ভালো আছেন। আগামী বৈঠক এখানে, আসবেন ঠিক। ইতি ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫

ভবদীয়

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পুঃ আপনাদের কবিতা
ত্রৈমাসিকের জন্যে
আমার লেখা নিয়েছিলেন কি?
যদি নিয়ে থাকেন তবে
প্রুফ কি হলো?

৯ই × ৭ই মাপের ধূসর রঙের মোটা কাগজ—এক পৃষ্ঠায় লেখা। 'অর্কেস্ট্রা' বেরোয় ১৯৩৫-এর সেপ্টেম্বরে। 'পূর্বাশা' সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত পত্রিকা—১৯৩২-এ ত্রিপুরায় এবং ১৯৩৩ থেকে কলকাতায় প্রকাশিত হতে থাকে। "কবিতা ত্রৈমাসিক"—বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা'।

১৩

১৩৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে অনুগৃহীত হলুম। রিভিউটি পূর্ব্বাশার কর্ত্তৃপক্ষদের পাঠিয়েছি, আশা করি আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে। লেখা চমৎকার হয়েছে। তাতে অর্কেষ্ট্রার প্রতি সুবিচারের আধিক্য

ঘটেছে ব'লেই এ-কথা বলছিনা—বরং সেটাই সমালোচনার একমাত্র দোষ—বলছি, আপনি তাতে যে-কাব্যবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন, তাই দেখে। আমার ত্রুটি-সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আমি প্রায় একমত। তবে আমার কাব্যবংশের গোষ্ঠীপতি হিসেবে মিলটন ও রাসিনের নাম নেওয়া কি ঠিক? বরং আমাকে মালার্মের গোত্রজ ও বোডোজ্-এর অনুকারক বলাই শ্রেয়; তাহলে অন্তত আমার স্খলন-পতনের অনিবার্য্যতা ধরা পড়বে। কিন্তু নিজের লেখার সম্বন্ধে জোর গলায় কথা কওয়ার মতো মূর্খ আমি নই। তাই অপেক্ষায় রইলুম, সাক্ষাতে আপনার মতামত আর একটু স্পষ্ট ক'রে বুঝে নেওয়ার জন্যে। তার পরে আত্মসংস্কারের চেষ্টা দেখবো।

17th Century Background খানি প্রায় দু বছর আগে বেরিয়েছে। এখন তার সমালোচনা কি আর চলবে? কিন্তু অন্য বইগুলির পরিচয় যদি দু-একজন নবীন লেখককে দিয়ে করিয়ে দেন, তবে সত্যাই উপকৃত হবো। নতুন কবিত্রয়ের বিষয়ে লেখাটায় হাত দিয়েছেন তো? এবং দৃষ্টিপ্রদীপ-সম্বন্ধে? তিন-চার দিনের মধ্যেই ছাপাখানার কাজ সুরু করবো।

আপনাকে অনেক দিন দেখিনি। সময়মতো আসবেন কোনো সময়ে। আশা করি ভালো আছেন এবং বাড়ির কুশল। ইতি ১৫ নভেম্বর ১৯৩৫

ভবদীয়

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

১১নং চিঠির মতো কাগজ। যত্ন করে ধরে ধরে লেখা। 17th Century Background—লেখক: Basil Willey. (প্রকাশকাল, নভেম্বর ১৯৩৩)। নতুন কবিত্রয়—Manifold, D. Martin ও Alan Rock—এই তিনজন ইংরেজ কবির কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র আলোচনা বেরোয় 'পরিচয়', ভাদ্র ১৩৪১-তে।

139, CORNWALLIS STREET,
CALCUTTA.

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে মর্ম্মাহত হয়েছি। আপনি শুক্রবার এসে ফিরে গিয়েছেন, সেটা আমার পক্ষে লজ্জার কথা, এবং আমাকে দিনের বেলা বাড়ি পাওয়া যায়না, এ-অভিযোগও নিঃসন্দেহে সত্য। আপনি এত দূরে থাকেন যে সকালে কিম্বা রাত্রে আপনাকে আসতে বলা সঙ্গত নয়। কাজেই ছুটির দিন ছাড়া আর উপায় কি। কবে এবং কখন আপনার সুবিধা হবে জানালে আমি নিশ্চয়ই বাড়ি থাকবো। কিন্তু সম্ভব হলে আগামী শুক্রবারের পরিচয়ে আসবেন (আমার বাড়িতে) ; সে-বৈঠকে য়োনে নোগুচি উপস্থিত হবেন ব'লে শুনছি।

বলাই বাহুল্য যে আপনার বুদ্ধির স্বাভাবিক প্রাখর্য্য ও আপনার অধীত বিদ্যার ব্যাপকতা সম্বন্ধে আমার এতটুকুও সংশয় নেই। সেইজন্যেই আপনার সঙ্গে কোনো প্রসঙ্গে একমত না-হতে পারলে আমি সে-মতান্তরের কারণ খুঁজতে চেষ্টা করি। এই উদ্দেশ্যেই অর্কেষ্ট্রা সম্বন্ধে ছোটোখাটো এক-আধটা মতদ্বৈতের উল্লেখ করেছিলুম। আসলে বিদ্যার্জ্জনে আমি কোনোদিনই উৎসাহ দেখাইনি ; এবং তুলনাজাতীয় ক্রিয়া যেহেতু পাণ্ডিত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তাই সেখানে আপনার চেয়ে আমার ভুলচুক হওয়াই বেশি স্বাভাবিক। সে যাই হোক, সহজ কথা এই যে আপনার রিভিউ সম্বন্ধে আমার যদি বা জিজ্ঞাসা থাকে, তবু আপত্তি কিছুমাত্র নেই।

দৃষ্টিপ্রদীপের সমালোচনা পড়েছি। ফলত মনে হচ্ছে বইখানার বিরুদ্ধে লেখকের বিশেষ কোনো নালিশ নেই, অথচ এই কথা স্বীকারে তিনি কুণ্ঠিত। তবু লেখাটি ভালোই। যদি এই

ঔদার্য্যের অভাব দূর করার প্রয়োজন তিনি অনুভব না-করেন, তবে বর্ত্তমান আকারেই লেখাটিকে ছাপতে দেবো। কিন্তু একবার 'রিভাইজ' করতে দোষ কি ?

আপনার মঙ্গল কামনা করি। ইতি ১০ নভেম্বর ১৯৩৫

বিনীত

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৭ই×৫' ৫ই মাপের চার-ভাজ-করা মাটা অ্যান্টিক কাগজের সামনে-পিছনে লেখা। ওপরে ইংরেজিতে নীল রঙে ঠিকানা খোদাই। যোনে নোগুচি—জাপানী কবি, রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ভারতে এসেছিলেন। বিষ্ণু দে জানান, "নোগুচির থেকে বাঙ [illegible] হীরেন্দ্রনাথ মিত্র-কৃত "দৃষ্টিপ্রদীপের সমালোচনা" বেরোয় 'পরিচয়'-এর মাঘ ১৩৪২ সংখ্যায়।

১৫

১৩৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি, যদিও তার মানে বুঝেছি এমন কথা বলতে পারবোনা। কিন্তু এইজন্যেই হয়তো আপনার পত্র আমার ভালো লাগে ; তার আড়ালে কি আছে তা ঠিক ধরতে পারিনা ব'লে তার থেকে আত্মপ্রসাদের উপাদান জোগাড় হয়। আপনার আলাপ-সম্বন্ধেও এই কথা খাটে, হয়তো তাই আপনার সাহচর্য্যে আমার কালজ্ঞান হারিয়ে যায়। কিন্তু তার জন্যে আপনার বা আমার দুঃখ করার কিছুই নেই। কারণ আমি একেবারে নিষ্কর্ম্মা মানুষ, সময়মতো নাইলে খেলে যে এক-আধ ঘণ্টা বাঁচে তাতো কোনো উপকারেই লাগেনা, এমন-কি মাঝে মাঝে সেই ফালতু অবকাশটুকু কি ক'রে কাটাবো তা ভেবে ভেবে তিত বিরক্ত হয়ে উঠি। কাজেই আপনি ইচ্ছামতো আসবেন যাবেন, তাতে আমি

আনন্দই পাবো, কখনো অসুবিধা বোধ করবোনা। বরং উল্টাতেই [উল্টোটাতেই] আক্ষেপের কারণ ঘট্‌বে।

কবিতা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বিশেষ কিছুই নেই, কিন্তু অন্যদের কতকগুলো মতামত আমি নিজস্ব ক'রে নিয়েছি। সেগুলোর আলোচনা করলে যদি আপনার প্রয়োজনসিদ্ধি হয়, তবে যে-কোনোদিন খুশি এসে তর্ক ক'রে যাবেন। সে-তর্কে আপনার কোনো উপকার যদিও হবেনা, তবু আমার নিজের অনেক কাজ হবে। কারণ আপনার মতো সজাগ মনের ধাক্কা না-খেলে আমার বুদ্ধি খোলেনা, মতসর্ব্বস্ব অজ্ঞতাও দূর হয় না।

আমার চরিত্র্য [চারিত্র্য]-সম্বন্ধে আমার নিজের ধারণা স্বভাবতই অত্যন্ত অস্পষ্ট। কাজেই এ-বিষয়ে কিছু লিখতে পারলুমনা। তবে আপনার মন্তব্য শুনে কৌতূহল হচ্ছে। সাক্ষাতে সে-কৌতূহল চরিতার্থ করবো। আমার বিশ্বাস আমি খুব ঘোরালো মানুষ নই, সুতরাং আপনার কল্পিত সুধীন্দ্রদত্তের সঙ্গে বাস্তব সুধীন্দ্রদত্তের কোনো উল্লেখযোগ্য তফাৎ থাকা উচিত নয়। কেন আছে, সেটা গবেষণার বিষয়।

পূর্ব্বাশা বেরুচ্ছেনা জেনে দুঃখিত হলুম। আপনার প্রবন্ধটি উদ্ধার করার চেষ্টা দেখবো। আশা করি ফল ফলবে; কারণ তাতে শুধু আমার প্রশংসাই নেই, আপনার অত্যাশ্চর্য্য কাব্যজিজ্ঞাসার নমুনা আছে। ইতি ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬

ভবদীয়

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

১১ বা ১৩ নং চিঠির মতোই কাগজ- ভরে এখানে সামনে-পিছনে ছাড়াও ভেতরের পৃষ্ঠায় লম্বালম্বি লেখা।

১৩৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে কতখানি খুশি হয়েছি, তা প্রকাশ করতে গেলে ছড়া কাটতে হয়, এবং সৌভাগ্যক্রমে ভগবান আমার সে-শক্তি ফিরিয়ে নিয়েছেন। তাই এখানে এইটুকু ব'লেই ক্ষান্ত হচ্ছি যে লোকপরম্পরা আপনার অস্বাস্থ্যের অসম্পূর্ণ সংবাদ শুনে শুনে মনটা বেশ একটু খারাপ হয়েছিলো; এখন আপনার চিঠি পেয়ে যদিও বুঝলুম না যে আপনি সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন, তবু এটা অনুমান করলুম যে যখন লিখতে পারছেন, তখন একেবারে আরোগ্য না-হলেও, আপনি অন্তত আরোগ্যের পথে। সে যাই হোক, সম্ভব হলে যথাসত্বর সবিস্তারে আপনার স্বাস্থ্যসমাচার দিয়ে বাধিত করবেন। কবে কলকাতায় ফিরছেন?

আমাদের কোনো উল্লেখযোগ্য খবর নেই। বন্ধুবান্ধবেরা অনেকেই এখনো পুজোর ছুটি কাটিয়ে কাজে যোগ দেননি। তবে ইতিমধ্যেই ব্যস্তবাগীশদের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করছি। সত্যেন আজ ঢাকায় ফিরলো, ধূর্জ্জটি শনিবার লক্ষ্ণৌ যাবে বলে আজ থেকে দুধ-পাঁউরুটির পথ্যে দিন অতিবাহিত করছি [করছে], এমনকি কর্ত্তব্যের ডাকে শাহেদ সুরহুর্বর্দ্দি সুদ্ধ ছ মাস বাদে আজ য়ুনিভার্সিটিতে পদার্পণ করেছে। অপূর্ব্ব ফিরছে পঁচিশে তারিখে। মল্লিকদার চিঠি এসেছে তিনি সাত হপ্তা বাদে ডাঙায় পা দিয়েছেন। কবির নাকি কৃষকদের কাছে ইকনমিক্ ইণ্টারপ্রিটেশনের ব্যাখ্যা করে করে এমন থ'কে গেছেন যে বুর্জ্জোয়া পারিবারিক জীবনের বাইরে কেউ আর তাঁর টিকি সুদ্ধ দেখতে পাচ্ছে না। আইয়ুব চিরদিনই কাজের মানুষ, ইদানীং তিনি কাণ্টের নিবর্বুদ্ধিতা প্রমাণে আরো বদ্ধপরিকর

হয়েছেন ; তাই তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ পাওয়া ভার। কিন্তু আমার বেকার জীবনের বিশেষ কোনো তারতম্য নেই, গত কাল অগ্রহায়ণ সংখ্যার প্রুফ শেষ করেছি, বৃহষ্পতিবারের [বৃহস্পতিবারের] আগে মাঘ সংখ্যার জোগাড়যন্তরে হাত দিতে হবেনা। তাই ইতিমধ্যে হাউসম্যানের 'মোর পোয়েম্‌স্' প'ড়ে মনে করবার চেষ্টা করছি কিসের জন্যে এই স্বর্গীয় ভাববিলাসীটিকে একদিন কবি ব'লে ভুল করেছিলুম। কিন্তু স্মৃতির কাছে কোনো সদুত্তর পাচ্ছি না। তাই আজ এক কপি রোজার ফ্রাই কৃত মালার্মের অনুবাদ কিনে এনেছি এই আশায় যে হয়তো এখানে আর ভূতপূর্ব্ব উৎসাহের জন্যে আত্মধিক্কার ভোগ করতে হবেনা।

এখানে দারুণ গরম ; তাছাড়া আমার ঘরের বিজলি বাতি হঠাৎ নেহাৎ নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। তাই কাগজ ফুরনোর অজুহাতে এই জায়গাতেই আজ ইতি করলুম। ইতি ১৭ নভেম্বর ১৯৩৬

ভবদীয়

শ্রী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

আগের চিঠির মতোই কাগজ—তবে এখানে পর পর চার পৃষ্ঠা একই ভাবে টানা লেখা। ১৯৩৫-এর জুন-জুলাইতে বিষ্ণু দে-র "gall bladder inflamed হয়ে stone" হয়—১৯৩৬-এ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের উদ্যোগে তার মধুপুর যাওয়া হয়। মধুপুরের ঠিকানাতেই চিঠিটি লেখা।

সত্যেন—সত্যেন্দ্রনাথ বসু। অপূর্ব্ব—অপূর্বকুমার চন্দ। মল্লিকদা—বসন্তকুমার মল্লিক। কবির—হুমায়ুন কবীর। আইয়ুব—আবু সয়ীদ আইয়ুব।

১৭

১৩৯ বি, কর্ণ্‌ওয়ালিস্‌ স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিয়বরেষু,

ধূর্জ্জটীর [ধূর্জ্জটির] কাছে খবর পেলুম যে আপনি পুরী থেকে স্বাস্থ্যসঞ্চয় ক'রে ফিরেছেন। তাই লেখার জন্যে তলব না-দিয়ে

আর থাকতে পারলুমনা। অসুখ-বিসুখ ক'রে আমি যথাসময়ে কলকাতায় ফিরতে পারিনি। এসেই দেখছি শ্রাবণ সংখ্যা প্রেসে দেবার সময় হয়েছে। অথচ হাত একেবারে খালি। আপনার কাছ থেকে অনেক লেখা পাওনা। Oxford Book of Modern Verse আর আটকে রাখা উচিত নয়, ইতিমধ্যেই ছ মাস কেটে গেছে। সমর বাবুকে দিয়েও কি যেন সমালোচনা করিয়ে দেবেন বলেছিলেন।

কবে এ পাড়ায় আসছেন? কাল পরিচয় প্রবোধ বাগচীর বাড়ি। নিশ্চয় যাবেন। অনেক দিন আপনাকে না-দেখে সাক্ষাতের জন্যে উৎসুক হয়ে আছি। ইতি ১৭ জুন ১৯৩৭ বৃহষ্পতিবার [বৃহস্পতিবার]

ভবদীয়
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

কলটান, নীলাভ প্যাডের কাগজে (৮ই×৭ই) লেখা। Oxford Book of Modern Verse-এর সমালোচনা বোধহয় বিষ্ণু দে করেন নি। সমরবাবু, অর্থাৎ সমর সেনের সমালোচনা 'পরিচয়', চৈত্র ১৩৪৩-এ বেরোয়—Auden (Look Stranger), Isherwood and Auden (Ascent of F6), A. E. Housman (More Poems)-এর সমালোচনা।

১৮

মে ফ্লেন্,
লালগড়,
মধুপুর।

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি সব সময়েই উপভোগ্য; কিন্তু মধুপুরী "বিবিক্তি" তাকে আরো উপাদেয় ক'রে তুলেছে। সেইজন্যেই সঙ্কোচ হচ্ছে তার জবাব দিতে। এ-জায়গার সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে; সুতরাং আপনাকে জানানো অনাবশ্যক যে এখানে রেল যাতায়াতেও আমরা রোমাঞ্চ অনুভব করি। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মধ্যে

সবচেয়ে উত্তেজক ঘটনা হচ্ছে সকাল বিকেলের বাড্‌মিন্‌টন্‌ খেলা ; এবং আহারের মাত্রা যেহেতু প্রায়ই পরিপাক-শক্তিকে ছাড়িয়ে যায়, তাই খেলে খেলে সর্ব্বাঙ্গে বিষফোড়ার মতো ব্যথা করিয়ে, সে-ব্যথা কমাবার আশায় আমরা ঘণ্টা নয়েক ঘুমোই। এ-অবস্থায় চিঠি লেখার সম্বন্ধে আমার স্বাভাবিক জড়তা যে অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠবে, তাতে আর বিচিত্র কি ?

অবশ্য এখানে আসবার সময় ভেবেছিলুম রাস্তায় বেরোলে যখন ধূলো খাওয়া অনিবার্য্য, এবং বাড়িতে ব'সে থাকলে যেকালে আত্মধিক্কার বাগ মানে না, তখন উদয়াস্ত লেখা-পড়ার কাজ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। সেই বিশ্বাসের বশে সঙ্গে বই এনেছিলুম একুশখানা এবং রুল্‌-কাটা কাগজ চার দিস্তে। কিন্তু এত দিনে মাত্র একখানা উপন্যাস শেষ করেছি। সেটার অর্দ্ধেকটা পড়ে ফেলেছিলুম রেল্‌গাড়িতে। এবং আশা করছি প্যাকেট্‌ ঠিক আছে দেখে মনোহারী কাগজগুলো ফেরৎ নেবে।

তবে এই জান্তব জীবন খুব খারাপ লাগছে বললে সত্যের অপলাপ হবে। আপনি যদি আসতেন তাহলে আপনার নেহাৎ মন্দ লাগতো না। এখনো পরীক্ষা ক'রে দেখার সময় আছে ; কারণ আমরা ২৯শের আগে ফিরবো না ব'লে ঠিক আছে। এবং বাবুলের জন্যে ভয় নেই, সে জানিয়েছে যে আপনি এলে সে কুয়োয় ঝাঁপ দিতে রাজী আছে। হয়তো প্রতিজ্ঞাপালনের সময়ে তার মনে থাক্‌বেনা যে সে ব্রহ্মানন্দের দৌহিত্র। কিন্তু তাহলেও আপনাকে মাথা গোঁজবার একটু স্থান দিতে পারবো। অতএব আসতে ইতস্তত করবেন না। সত্যিই তাতে আমরা সকলেই খুশী ও কৃতজ্ঞ হবো। ইতি ২৩ জানুয়ারি ১৯৪০

স্নেহার্থী

সুধীন্দ্র

রুলটানা ফিরোজা রঙের প্যাডের কাগজে (৮'৮ ই×৬'৭ ই) লেখা। মে ফেনের বাড়ি সুধীন্দ্রনাথের শ্বশুরবাড়ি—প্রথমা স্ত্রী ছবি-র সূত্রে। বাবুল—হিমাংশু মহলানবিশের ডাকনাম।

১৯

"হিমানী"
কালিংপং

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি, ধন্যবাদ। চিঠি লেখায় আমার আলস্য ফ্রয়েডী মনস্তত্ত্বের বিষয়ীভূত ; সুতরাং তার জন্যে মার্জ্জনা চাওয়ার খুব বেশী মানে হয় না। তাছাড়া কালিংপং-এর মতো জায়গায় পত্রজাত করবো, এমন প্রসঙ্গই বা কোথায় ? অবশ্য প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসী হতে পারলে, আজকের প্রাতঃকালীন প্রসাদের বর্ণনায় দু-চার পাতা সহজেই ভরানো যেতো। কিন্তু নিসর্গচিত্র, অর্থাৎ কিনা "ল্যাণ্ডস্কেপ্ পেন্টিং" সম্পর্কে আমি ভালেরি-র সঙ্গেই একমত ; আমারও বিশ্বাস যে এই জাতীয় অলেখ্য [আলেখ্য] মানুষী রূপজ্ঞানের পরিপন্থী। এবং আমাদের এখানকার জীবনযাত্রা অমানুষিক হোক বা না হোক, মুখ্যত জান্তব। অর্থাৎ আহার, বিহার, নিদ্রা ; এবং নেহাৎ জল-ঝড় বাড়িতে বন্ধ থাকলে, ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাস পড়া। এ-রকম অবস্থায় মৌনকে স্বভাবতই হিরণ্ময় লাগে।

আপনাদের ছুটি কলকাতাতেই কাটবে শুনে দুঃখিত হলুম, বিশেষ এই জন্যে যে আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য এখন ঘোরাফেরার প্রতিকূল। আশা করি বৈদ্যুতিক চিকিৎসায় তাঁর উপকার হচ্ছে। আসবার আগে তাঁকে দেখে আসবো ব'লে সঙ্কল্প ক'রে রেখেছিলুম। কিন্তু অপ্রত্যাশিত গণ্ডগোলে শেষ ক দিন এমন বিশৃঙ্খলায় কাটলো যে শেষ পর্য্যন্ত ধার্য্য দিনে কলকাতা ছাড়তে পারবো কিনা সন্দেহ ছিলো। এই কারণেই আপনার ও হীরেনের সৌজন্যের প্রতিদান

দিতে পারি নি। চিঠি লিখে ক্ষমা চাইবার সুদ্ধ উপায় ছিলো না, কেননা আপনার নূতন বাড়ির নম্বর আমার কিছুতেই মনে থাকে না; এবং হীরেনের ঠিকানা একবারমাত্র কর্ণগোচর হয়েছিলো। তবে আপনাদের কাছে আমি অজ্ঞানত অনেক বারই অপরাধ করেছি: প্রতি বারই যখন আপনারা মাপ করতে পেরেছেন, তখন এবারেও নিশ্চয় দোষ ধরবেন না।

এবারে আমাদের এখানে বেজায় ভিড়: উপরের তিনটি মাত্র শোবার ঘরে আমরা ছ জন যেমন-তেমন ক'রে শুচ্ছি, এবং নিচে যে-একটা ঘর আছে, তাতে এত দিন এক বিদেশী দম্পতী ছিলেন, আজ বোধহয় ধূর্জ্জটি আসবেন। অবশ্য আপনি একা এলে এর মধ্যেই কোনো এক রকম ক'রে কুলিয়ে যাবে—যদি আইয়ুব আসেন, তাহলেও। কিন্তু সস্ত্রীক এলে, আপনাদের অত্যন্ত অসুবিধা হবে। আগে থেকে জানা থাকলে, ধূর্জ্জটি ও আইয়ুবকে না বল্‌লেও চলতো; এখন তাঁদের নিষেধ করা অভদ্রতার চূড়ান্ত। অতএব এই আশাই করছি যে ভবিষ্যতে আমি আবার কালিংপঙে এলে, আপনারাও আসতে পারবেন।

এখানেও গত কাল একটি সাহিত্যসভা হয়ে গেল। পিতৃদেবের অনুরোধে তাতে আমাকে কবিতাপাঠ করতে হয়েছিলো। আগে ভেবেছিলুম আপনি-প্রমুখ দু-এক জন আধুনিক বাঙালী কবির রচনাই পড়বো; কিন্তু বই-এর অভাবে নিজের লেখাই আবৃত্তি করলুম, অত্যন্ত ভীত, বিচলিত কণ্ঠে, একেবারে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে। অথচ সভাস্থ লোকেদের দেখে আমারও আপনার মতো বলতে ইচ্ছে করছিলো Silly, Jejune ইত্যাদি। আমার পরে কান্তি ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রী শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পড়লেন, এবং তাঁর পরে স্বয়ং কান্তি ঘোষ শোনালেন ওমর খৈয়াম থেকে আবৃত্তি। সুতরাং আপনার কবিতা না পড়ে আপনার উপকারই করেছি বোধহয়।

আপনি এখন লেখার মেজাজে রয়েছেন জেনে আহ্লাদ হলো। প্রবন্ধগুলি দেখবার জন্যে উৎসুক রইলুম। কলকাতার খবর কি? আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্যসমাচার সবিশেষ দেবেন। আমরা একটু বেশী রকম সুস্থ রয়েছি। ইতি ১৯মে ১৯৪১

স্নেহার্থী

সুধীন্দ্র

আগের চিঠির মতোই কাগজ—তবে আকারে বড় [illegible]। হীরেন—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

১০

"হিমানী"

কালিংপং

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি পাবার পর দিনই ধূর্জটি আর আমি তাগ্‌দা হয়ে দার্জিলিং যাত্রা করি; দিন দুই-তিন হলো ফিরেছি বটে, কিন্তু মাসখানেকের বিশুদ্ধ শরীরচর্চার ফলে সম্প্রতি মনের অবস্থা এমনই শোচনীয় হয়েছে যে চিঠি লিখতে গেলে যেটুকু বুদ্ধি-বিদ্যার প্রয়োজন, তাও প্রায়ই জুগিয়ে উঠতে পারি না। হয়তো সেইজন্যেই আপনার ঠাট্টাকে ঠিক ঠাট্টা হিসেবে দেখি নি, ভেবেছিলুম আমাদের অসুবিধায় ফেলবার ভয় না থাকলে আপনি এখানে আসতেন। দুঃখের বিষয়, এবারে সে-অসুবিধা সত্যই ছিলো। তাই আপনার পরিহাসের উত্তরে গাম্ভীর্য্য এসে পড়েছিলো; ক্ষমা করবেন।

আপনার কবিতা-দুটি চমৎকার; পেলে পরিচয় ধন্য হবে; হাবলের কাছে কপি পাঠিয়ে বাধিত করবেন। পরিচয়ে আপনার অনুবাদটিও ভালো লাগলো। এই সব প্রমাণ দেখে মনে হচ্ছে সত্যিই লেখার দিক দিয়ে এটা আপনার সুসময়। অতএব আপনাকে হিংসা করতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু তাতে লাভ কি, বলুন? তাতে তো আমার মাথার বা মনের জড়তা কাটবে না। আসলে আমাকে "লস্ট্‌ লীডর" ব'লে

আপনি আমাকে যে-সম্মান দিতে চেয়েছেন, তা আমার প্রাপ্যই নয়। কারণ পরিচালনা প্রগতিকেরই কাজ; এবং আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকলেও, আমার পাঠকমাত্রেই জানেন যে আমি আজীবন প্রগতিপরিপন্থী। অবশ্য বাংলার ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ্ কে, তা আমার অবিদিত, কিন্তু আমার মতো অহংসর্ব্বস্ব ব্যক্তিও এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে সে-কবির সঙ্গে আমার তুলনা, তাঁর প্রতি অসম্ভ্রম প্রদর্শন।

আপনার স্ত্রীর অস্বাস্থ্যের এখনো প্রতিকার হচ্ছে না জেনে চিন্তিত হয়েছি; আশা করি ব্যাপারটা গুরুতর নয়, তাঁর আরোগ্য শুধু সময়সাপেক্ষ। আমার গত চিঠি তাঁকে বিচলিত ক'রে তুলেছিলো দেখে লজ্জাবোধ করছি।

এখানকার সাময়িক কুশল। ধূর্জ্জটি আর আমি হয়তো ৫ তারিখে কলকাতা রওনা হবো। তবে এখানে এখনো বর্ষার প্রকোপ দেখা দেয়নি, তাই একেবারে নিশ্চিত হতে পারছি না। ইতি ১ জুন ১৯৪১

ভবদীয়

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সাদা পাতলা ব্যাঙ্ক-পেপারে (৯'৬ই × ৭'৮ই) লেখা। "আপনার কবিতা দুটি"—বিষ্ণু দের 'একটি প্রেমের কবিতা' ('পরিচয়', আষাঢ় ১৩৪৮) এবং 'মধ্যবিত্ত পূজার ছুটি' (ঐ, কার্তিক ১৩৪৮)—দুটি কবিতাই 'পূর্বলেখ' গ্রন্থে আছে। হাবল—হিরণকুমার সান্যাল। তখন সুধীন্দ্রনাথ ও তিনি 'পরিচয়'-এর সম্পাদক।

২১

৪৯ সি, হাজরা রোড্,

বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

প্রিয়বরেষু,

বাড়ি বয়ে পেট্রোল দিয়ে যাওয়া যে-ধরণের বদান্যতার পরিচায়ক, তার দৃষ্টান্ত মনুষ্যসমাজে খুব বেশী নেই। হয়তো তাই, সেজন্যে

আমি কতখানি কৃতজ্ঞ, তা বলবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। উপরন্তু এ-দান অপ্রত্যাশিত; আমি ভেবেছিলুম আমার আবেদন আপনারা এত দিনে নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন; অতএব অনিচ্ছুক পুঁজিদারদের উদ্‌ব্যস্ত ক'রে নিজের প্রয়োজনও কোনোক্রমে মিটিয়ে নিয়েছি। এ-অবস্থায়, যে-নিরাসক্তি শিল্পসামগ্রী উপভোগের সর্ব্বসম্মত উপায়, তাতে আমি অধিকারী; কিন্তু সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি ভাষাতীত ব্যাপার; অন্ততপক্ষে হেতুপ্রধান গদ্যে তার অভিব্যক্তি প্রায় অসম্ভব, এবং পদ্যরচনা অনেক দিন থেকেই আমার ক্ষমতার বাইরে। অগত্যা আজ এইটুকু জানিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছি যে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞ, এবং সে কৃতজ্ঞতা অনির্ব্বচনীয়।

আশা করেছিলুম ছুটির মধ্যে আপনার কাজের ভিড় কমলে নিশ্চয়ই দেখা পাবো। সেইজন্যে আপনারা পুরী গিয়েছেন শুনে বেশ খানিকটা নিরাশ হলুম। কিন্তু কলকাতার বর্ত্তমান আবহাওয়া এমনই অসহ্য যে এর ভিতরে অতি বড় শত্রু ছাড়া আর কাউকেই আবদ্ধ দেখতে ইচ্ছা করে না। গত আট-দশ দিন ধ'রে আকাশ সারা ক্ষণ পাঁশুটে মেঘে ছেয়ে আছে; এবং প্রথম চার দিনের অবিশ্রান্ত বৃষ্টি সম্প্রতি যদিও থেমেছে, তবু গরম কমবার নাম নেই।

সে-দিন বার্টলি-দম্পতীর ওখানে খেতে গিয়ে জেম্‌স্‌-এর মুখে পূর্ব্বলেখের অনেক সাধুবাদ শুনলুম। অবশ্য তিনি এখনো বিনা পরিশ্রমে বাংলা পড়তে পারেন না; কিন্তু আপনার বই হাতে আসার পরে আমাদের মাতৃভাষা সম্বন্ধে তাঁর ঔদাসীন্য, হয়তো বা অবজ্ঞাও, কেটেছে মনে হলো। আপনার নূতন বই সম্পর্কে আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া আপনাকে ইতিপূর্ব্বেই জানিয়েছি। তার পরে পাঁচটা বাজে কাজে এ-দিকে আর মন দিতে পারিনি; তবু মধ্যে মধ্যে উল্‌টে পালটে দেখে আমার আদিম বিশ্বাসই পাকা হচ্ছে। অর্থাৎ গোটা ছয়েক কবিতা আমাকে অসম্ভব রকম মাতিয়ে তোলে, সে-বিষয়ে আমার স্বতন্ত্র আদর্শ কোনো প্রশ্নই তোলে না। কিন্তু

অন্যত্র বিরুদ্ধ বুদ্ধি পরিগ্রহণের অন্তরায়; পদে পদে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় কেন, এবং বিনা সাহায্যে কোনো সদ্ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না। সুতরাং "পূর্ব্বলেখ" সমালোচনা করার যোগ্যতা আমার নেই; যে-অনুকম্পা ব্যতিরেকে মহত্তম কাব্যেরও রসগ্রহণ অসম্ভব, নিজের মধ্যে তার শোচনীয় অভাব অনুভব করছি; এবং ভয় হচ্ছে এই অভাবের জন্যে আপনি পরোক্ষ ভাবেও দায়ী নন, এটা আমার বয়োবৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী ফল।

আশা করি কুশলে আছেন সকলেই। কবে ফিরবেন? আমার প্রবন্ধ শেষ ক'রে আনা চাই। শীলা-জন, আইলিন-টম গোলাপফুলের রং মেখে সিমলা থেকে ফিরে, কলকাতার বিপক্ষে মানহানিকর কথাবার্ত্তা কয়ে বেড়াচ্ছে। আমাদের সাময়িক মঙ্গল। আইয়ুবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কেন জানি আজকাল কম হয়। হাবল ডুমুরফুলের চেয়েও দুর্লভ। ইতি ১৪ অক্টোবর ১৯৪১

ভবদীয়

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

আগের চিঠির মতোই কাগজ। চিঠিতে প্রাপকের ঠিকানা: 'Nilima,' Beach, Puri। বার্টলি-দম্পতী—জেমস্ ও এলসা বার্টলি: আইরিশ, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, ল্যাটিনাদি ভাষায় পণ্ডিত। 'পূর্বলেখ'—প্রকাশকাল: জুন ১৯৪১। শীলা-জন এবং আইলিন-টম—"শীলা বনার্জি জন অডেনের (কবি W. H. Auden-এর দাদা) স্ত্রী। মৃণালিনী এমার্সন, শীলা অডেন, অনিলা ওরফে আইলিন গ্রেহাম, ইন্দিরা তালিয়াথান—এরা চার বোন। ডবলিউ সি বনার্জির নাতনি, আর সি বনার্জির মেয়ে।" (বিষ্ণু দে-র চিঠি)।

২১

৬নং সুইট্,

৬, রাসেল্ স্ট্রীট,

কলিকাতা

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠির জবাব দিতে এত দেরি করলুম ব'লে অপরাধ নেবেন না। সেখানি হাতে আসার পর থেকে বাজে কাজ সমস্ত

অবসর জুড়ে বসেছিলো, এমনকি যথেষ্ট পরিমাণে ঘুমবার সময় পর্য্যন্ত পাচ্ছিলুমনা। এখন একটু অবকাশ পেয়েছি বটে, কিন্তু নূতন লেখা আরম্ভ করার মনোভাব আয়ত্তে নেই, বহিঃপ্রেরণার অভাবও শোচনীয়। আসল কথা, আমি চির দিনই কম লিখি; তাই কোনো অপ্রকাশিত রচনা আমার কাছে নেই—কবিতার অনুবাদও না। অগ্যতা আপনাদের সঙ্কলনের প্রথম সংখ্যায় নিজের নাম দেখার সৌভাগ্য আমার ঘটবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কোনো কবিতার তর্জ্জমা করতে পারি, তাহলে তার গ্রহণ-প্রত্যাখান নির্ভর করবে আপনার খুশির উপরে।

আপনাদের অস্বাস্থ্যের খবর শুনে খারাপ লাগলো। আশা করি উপস্থিত সকলে ভালো আছেন। ইতি ৭ জানুয়ারি ১৯৪৭

ভবদীয়

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৮ই ×৫ই নীল কাগজে লেখা। "আপনাদের সঙ্কলন"—পরিকল্পিত 'সোনার', পরে সেটা 'সাহিত্যপত্র' নামে বেরোয়। বিষ্ণু দে এ-সময়ে "malignant malaria"-তে ভোগেন।

২৩

৬নং সুইট্
৬ রাসেল্ স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিয়বরেষু,

আপনার ৮ তারিখের চিঠি মাত্র আজ হস্তগত হলো। কৈ, প্রবন্ধের বই তো এ-পর্য্যন্ত এখানে আসেনি। তাহলে হারিয়ে গেল না কি? আজকাল ডাকঘরের যা অবস্থা, তাতে কিছুই বিচিত্র নয়।

সম্প্রতি অনেকগুলি বড় কবিতা শেষ করেছেন শুনে খুব খুশী হলুম—আশা করি শীঘ্রই দেখতে পাবো।

আমার লেখার যুগ অতীত হয়ে গেছে। সুতরাং আপনাদের

আশুপ্রকাশ্য ত্রৈমাসিক-দুটিতে নিজের নাম দেখতে পাবো বলে আশা নেই। তার অবকাশই বা কোথায়? প্রগতিক পত্রিকা নিশ্চয়ই প্রতিবিপ্লবী রচনা প্রকাশের স্থান নয়।

আশা করি আপনারা সকলে কুশলে আছেন। আপনার স্ত্রীকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাবেন। ইতি ১২ মে ১৯৪৭

ভবদীয়

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৭ই×৫'৪ই সাদা কাগজে লেখা। প্রবন্ধের বই—'রুচি ও প্রগতি' (প্রকাশকাল: ১৯৪৬)। বড় কবিতা—'সন্দ্বীপের চর' ও 'অন্বিষ্ট'-র বড় কবিতা। আশুপ্রকাশ্য ত্রৈমাসিক—'লোকায়ত', পরে 'সাহিত্যপত্র'।

২৪

THE STATESMAN LTD.

STATESMAN HOUSE

Our Ref.........   Calcutta.........

প্রিয়বরেষু,

আপনার সঙ্গে দেখা হলো না বলে খারাপ লাগছে। ছাড়পত্র দেওয়ার নিয়মটা নূতন, নাছোড়বন্দা প্রকাশপ্রার্থীদের হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায়। কিন্তু সে-নিয়ম না থাকলেও কাল আপনার সঙ্গে দেখা হতো না, কারণ খানিক ক্ষণের জন্যে আমাকে বেরোতে হয়েছিলো, ফিরে শুনলুম আপনি এসেছিলেন।

রিপোর্ট সংবাদসম্পাদককে দিয়েছি। কিন্তু স্টেটস্‌ম্যানের মতে রেডিও খবরের কাগজের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই পারত পক্ষে আমরা রেডিও বিষয়ে কিছু বলিনা, বিশেষ করে বক্তব্য যদি রেডিওর বিরুদ্ধে হয়। সুতরাং খুব জোর হয়তো মিটিং-এর অতিসংক্ষিপ্ত উল্লেখমাত্রই বেরোবে। তাও যদি সম্পাদকের অনুমতি মেলে।

সেদিনের সভায় যাবার জন্যে তৈরী হয়েছিলুম; কিন্তু যাঁদের আসার কথা ছিলো তারা বড্ড তাড়াতাড়ি এসে গেলেন। সেইজন্যে শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারলুম না।

আপনার কবিতাগুলি দেখবার জন্যে সত্যই উৎসুক আছি। এক দিন নিয়ে আসুন না।

আমরা শীঘ্রই আপনাদের ওখানে আসবো। আশা করি সকলের খবর ভালো। ইতি ২৭ অগস্ট ১৯৪৭

ভবদীয়

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৭.৭ই×৬ই মাপের স্টেটসম্যানের প্যাডের সাদা কাগজে লেখা। সুধীন্দ্রনাথ তখন স্টেটসম্যান পত্রিকার সহকারী সম্পাদক (১৯৪৫-৪৯)। AIR-এর স্টেশন-ডিরেক্টর Zulfaquar Ali Bokhari-র আমলে কোনো ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট।

১৫

Also at Connaught Circus, New Delhi.
THE STATESMAN LTD.
Telephones: 5320-5333 (5 Lines)
STASEMAN HOUSE—CALCUTTA

প্রিয়বরেষু

দুটো অপ্রকাশিত অনুবাদ খুঁজে পেয়েছি—একটা গোয়টের, অন্যটা সিগ্‌ফ্রিড্‌ সসুনের। কপি ক'রে আজই পাঠাতে পারতুম; কিন্তু মনে হলো দুটোরই সংস্কার সম্ভব। এ-রকম মনোভাব নিয়ে কবিতা-প্রকাশ অনুচিত। অতএব একটু চেষ্টা করে দেখি; অকৃতকার্য্য হলে এই অবস্থাতেই পাঠাবো। ইতিমধ্যে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে সাহিত্যপত্রের প্রথম সংখ্যায় আমার লেখা যাবেই, যদি অবশ্য তর্জমা-দুটো আপনার ও সম্পাদকের পছন্দ হয়।

আশা করি আপনাদের কুশল। ইতি ২৮ জুন ১৯৪৮

স্নেহার্থী

সুধীন্দ্র

৮ই×৫ই মাপে স্টেটসমানের প্যাডের সাদা কাগজে লেখা। এ পাতার ২টি চিঠিই তাই। 'সাহিত্যপত্রে'র ১ম সংখ্যার প্রকাশকাল: শ্রাবণ ১৩৫৫ (১৯৪৮)। সুধীন্দ্রনাথের তর্জমা-দুটো—'স্বপ্নপ্রয়াণ' (সীগফ্রিড সসুন) ও 'সুরাত্রি' (গোটে)। দুটি অনুবাদই 'প্রতিধ্বনি'-তে (বাং ১৩৬১) আছে। 'সাহিত্যপত্রে'র সম্পাদক—চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২৬

THE STATESMAN.LTD.

[আগের চিঠির মতোই লেটারহেড]

প্রিয়বরেষু,

কথা দিয়েছিলুম বলে অনুবাদ-দুটো পাঠাচ্ছি; কিন্তু আমার বিবেচনায় একটাও প্রকাশযোগ্য নয়। অল্প কিছু সংস্কার করেছি। কিন্তু ষোলো বছর আগেকার তর্জ্জমা; মূল কাছে নেই; সুতরাং পরিমার্জ্জনে উন্নতি হলো না।

আশা করি আপনারা কুশলে আছেন। ইতি ৩০ জুন ১৯৪৮

স্নেহার্থী

সুধীন্দ্র

ষোল বছর আগের তর্জমা—'স্বপ্নপ্রয়াণ' ও 'স্বরাত্রি'-র আদিরচনার তারিখ যথাক্রমে ১৯৩১ ও ১৯৩২।

১৭

THE STATESMAN LTD

[আগের চিঠির মতোই লেটারহেড]

প্রিয়বরেষু,

সন্দীপের চরের সমালোচনা আমি করি, এটা বোধহয় বিধাতার ইচ্ছা নয়। পর পর দুটো রবিবার একটুও সময় পেলুম না, যদিও সঙ্কল্পের অভাব ছিলোনা। আমার কলম কত আস্তে চলে, তা আপনার জানা আছে। সুতরাং ভবিষ্যতে চেষ্টা করলেও প্রথম সংখ্যার জন্যে লিখে উঠতে পারবো না কোনো মতে। এ ক্ষেত্রে বইখানির বিচার অন্য কারো উপরে অর্পণ করাই সুবিবেচনার কাজ হবে।

আশা করি আপনাদের কুশল। এক দিন আসবেন। ইতি ১৯ জুলাই

স্নেহার্থী

সুধীন্দ্র

সাল নেই, কিন্তু এখানে রাখা হল, 'সাহিত্যপত্রে'র আশুপ্রকাশ্য ১ম সংখ্যা (১৯৪৮) যেহেতু এটারও আলোচ্য। "সন্দীপের চর"—বস্তুত নামটি 'সন্দীপের চর'—প্রকাশকাল : বাং ১৩৫৪ (১৯৪৭)।

২৮

THE STATESMAN LTD.

[আগের চিঠির মতোই লেটারহেড]

প্রিয়বরেষু,

আপনার সঙ্গে শেষ দেখা হবার পরেই দাঁতের যন্ত্রণায় ভুগছি। কোনো ক্রমে অফিস করি বটে, কিন্তু যে-কাজে অভিনিবেশ দরকার তাতে হাত দেওয়া অসম্ভব। সামনের কাল থেকে দাঁত তোলা শুরু হবে; আপদ চুকবে কত দিনে তার কোনো স্থিরতা নেই। সুতরাং সমালোচনা স্থগিতই আছে, এবং আমার উপরে তার ভার দিয়ে রাখলে, তা হয়তো অসম্পন্নই থেকে যাবে। অনুবাদটারও কিছু সংস্কার দরকার। তবে সেটা হয়তো অসাধ্য নয়; এবং সেটা কয়েক দিনের মধ্যেই হয়তো পাঠাতে পারবো।

আশা করি আপনাদের কুশল। ইতি ২৭ অগাস্ট ১৯৪৮

স্নেহার্থী

সুধীন্দ্র

অনুবাদ—হাইন্‌রিখ্ হাইনের অনুবাদ 'অবিশ্বাসী' (আদি-রচনা ১৩৩২, 'সাহিত্যপত্রে' প্রকাশকাল ১ বর্ষ ২ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৫)।

২৯

THE STATESMAN LTD.

[আগের চিঠির মতোই লেটারহেড]

প্রিয়বরেষু,

তিন দিন দাঁত তোলা বন্ধ ছিলো ব'লে শনিবার সন্ধ্যায় এক অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে গিয়েছিলুম। সেইজন্যেই আপনার সঙ্গে দেখা হলো না।

দুঃখের বিষয় আজ থেকে আবার উৎপাটন শুরু হবে। সুতরাং নবান্ন দেখতে যাওয়া এবারেও ভাগ্যে নেই।

এ-অফিসে অন্য কাউকে দিয়ে নবান্নের উপযুক্ত সমালোচনা হবে

কিনা সন্দেহ। কিন্তু মিনিকে বলে দেখতে পারেন ; লিন্‌সে আমাদের রঙ্গালয়ীয় বিচারক।

আশা করি আপনাদের সঙ্গে শীঘ্র দেখা হবে। অনুবাদ শনিবার ডাকে পাঠিয়েছি। ভালো নয়, কিন্তু অন্য কিছু নেই। ইতি ১৩ সেপ্টেম্বর ৪৮

ভবদীয়

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পুঃ নবান্নের টিকিট দুটো ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। সুতরাং স্টেটস্‌ম্যানের সমালোচকের জন্যে প্রয়োজন হলে অন্য টিকিটের ব্যবস্থা করবেন।

নবান্ন—ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ("ফ্যাসিষ্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের নাট্যবিভাগ") প্রযোজিত এবং শম্ভু মিত্র-বিজন ভট্টাচার্য পরিচালিত নাটক। প্রথম অভিনয়ঃ ১৯৪৪। চার বছর পরের অভিনয় এটি। মিনি এবং লিন্‌সে—মৃণালিনী এমার্সন ও তাঁর স্বামী লিণ্ডসে এমার্সন।

৩০

সেণ্ট্ অ্যান্‌স্ হোম্
বিমলিপটম্

প্রিয়বরেষু

আপনার রিখিয়ার পত্র কলকাতার ঠিকানা থেকে এখানে প্রেরীত [প্রেরিত] হয়ে মাত্র কাল হাতে এসেছে। সেপ্‌টেম্বরের শেষ দিকটা শরীর মোটেই ভালো যাচ্ছিলো না ; তাই গানের আসরে আসতে পারিনি এবং শেষ পর্য্যন্ত পনেরো দিনের ছুটি নিতে হয়েছে। এখানে এসেও খুব ভালো নেই। ফলত লেখা পড়া দুইই বন্ধ, এবং অবকাশের যেহেতু আর দু দিন মাত্র বাকী, তাই সাহিত্যপত্রের জন্যে প্রবন্ধ বা কবিতা রচনার আশা নেই। সন্দীপের চরের সমালোচনা অন্যের উপরে ন্যস্ত করাই প্রশস্ত, নচেৎ অপ্রকাশিত থেকে যাবে।

আপনার শরীরও খারাপ হয়েছিলো শুনে দুঃখিত হলুম। আশা

করি হাওয়া বদলে সেরে উঠেছেন। আপনার স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েরা ভালো আছেন তো? আপনারা কবে কলকাতায় ফিরছেন? আমরা রবিবার পৌঁছবো। সময় পেলে সস্ত্রীক আসবেন নিশ্চয়ই।

সাহিত্যপত্র ভালোই লাগছে; কিন্তু কাগজখানির সমষ্টিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে আমি স্বভাবতই বঞ্চিত। কোনো কোনো প্রবন্ধের পোলেমিকাল্ উগ্রতা আমাকে অল্প-বিস্তর পীড়া দেয়, যদিও বুঝি যে গোল্‌ডন্ মিনের চর্চা আরিস্টটেলীয় যুগের মতোই বর্ত্তমানেও অসম্ভব। বিজ্ঞাপনের চেষ্টা নিশ্চয়ই করবো; কিন্তু আমার সঙ্গে বহু লোকের, বিজ্ঞাপন দিতে পারে এমন লোকের, চেনা আছে মনে করলে ভুল হবে। ইতি ২৮ অক্টোবর

স্নেহার্থী

সুধীন্দ্র

৬'৯×৫'৪ই ঘন নীল কাগজে লেখা। সাল নেই, আভ্যন্তরীণ বিচারে ('সন্দীপের চর'-এর সমালোচনার জন্য তাগাদা ও 'সাহিত্যপত্রে'র প্রকাশ বিষয়ে মতামত) এখানে রাখা হল। ১৯৩৯ থেকেই প্রায় সাঁওতাল পরগণার নির্জন গ্রাম রিখিয়া বিষ্ণু দে-র অবকাশযাপনের স্থায়ী আবাস। বিষ্ণু দে-র চিঠি ওখান থেকেই লেখা।

৩১

৬নং সুইট্
৬, রাসেল্ স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি এইমাত্র পেলুম। এখনি উত্তর দিচ্ছি কারণ যদি আমার কবিতার কোনোটা আগামী সাহিত্যপত্রে ছাপেন, তাহলে তার উপরে বা পাদটীকায় লিখে দিতে হবে যে কবিতাটা "পুনর্লিখিত কৈশোরিক রচনা"।

বড় লেখাটা যদি আপনার পছন্দ হয়ে থাকে, তবে একটার বেশি ছাপবেন না; নচেৎ খুব জোর দুটো। বাকীগুলো সময়মতো

আমাকে ফেরৎ দেবেন। হয়তো আরো কিছু উন্নতি করা যেতে পারে।

আপনি যে-দিন এলেন ঠিক সেই দিনেই আমাদের বেরুতে হলো বলে আমরা দুঃখিত। রিখিয়া থেকে ফিরে সস্ত্রীক আসবেন নিশ্চয়ই।

আমার সমালোচনা আপনাকে স্টিম্যুলেট্ ক'রে এ-কথা শুনে ভালো লাগলো। কিন্তু আপনার লেখা সম্বন্ধে আমার মতামত মূল্যহীন। তাহলেও অন্বিষ্ট ভালো করে পড়ে আপনাকে চিঠি দেবো। ইতিমধ্যে পাতা উল্‌টে যা দেখেছি তা শক্ত লাগছে, যদিও অনেক জায়গাতেই ভালোও লাগছে যথেষ্ট। ইতি ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫০

ভবদীয়
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৮ই×৫ই ব্রাউন রঙের কাগজ। চিঠিতে যে কবিতাগুলোর কথা বলা হয়েছে, সেগুলো 'সাহিত্যপত্রে'র পর পর ৩টি সংখ্যায় ছাপা হয়: ১. 'অনিকেত'—কার্তিক ১৩৫৭, ২. 'পুনরাবৃত্তি'—মাঘ ১৩৫৭; ৩. 'প্রত্যাখ্যান'—বৈশাখ ১৩৫৮। সব কবিতাই 'সংবর্ত'-তে আছে। "পুনর্লিখিত কৈশোরিক রচনা", কারণ তিনটি কবিতারই আদি রচনার তারিখ যথাক্রমে, বাং ১৩৩২, ১৩৩০, ১৩৩১। 'অন্বিষ্ট'—প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর ১৯৫০।

৩২

৬নং স্যুইট্
৬ রাসেল স্ট্রীট
কলিকাতা ১৬

প্রিয়বরেষু,

"সাহিত্যের ভবিষ্যৎ"-এর প্রাপ্তিস্বীকারে এত দেরি হলো ব'লে অপরাধ নেবেন না। বইখানি হাতে আসতেই পড়তে শুরু করেছিলুম; কিন্তু কলকাতার ব্যাঘাত এমনই অপরাজেয় যে পড়া শেষ করেছি অল্প কয়েক দিন আগে। সুতরাং ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদির উৎকর্ষ বাদ

দিয়েও বলতে পারি যে উৎসর্গপত্রে আমার নাম লিখে আমার প্রতি অনুচিত সম্মান দেখিয়েছেন।—সেজন্যে আমি সত্যই কৃতজ্ঞ, এবং হীরেন যখন মার্ক্সবাদী, তখন আমার নামের সঙ্গে তাঁর নামের যোগে তিনিও নিশ্চয় উপাদেয় ডায়ালেক্‌টিকের আস্বাদ পাবেন।

গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধের অধিকাংশই আমার পূর্বপরিচিত। অতএব বর্ত্তমান সংস্করণে সেগুলির রূপান্তর সহজেই চোখে পড়লো। আমার বিশ্বাস সংস্কার সর্ব্বত্রই সার্থক হয়েছে। হয়তো এখনো স্থানে স্থানে অর্থাগম কষ্টসাধ্য ; কিন্তু সে-দুরূহতার মূলে ব্যাকরণের ব্যক্তিগত ব্যবহার নেই, আছে আপনার বহুমুখী পাণ্ডিত্য ; এবং আমি যেহেতু চির দিনই শেষোক্ত গুণের ভক্ত, তাই, এক নাম ছাড়া, "সাহিত্যের ভবিষ্যৎ"-এর প্রায় সবই আমার ভালো লাগলো।

আপনার সিদ্ধান্তের সঙ্গেও আমি মোটামুটি একমত। কিন্তু অনেক জায়গায় আপনার যুক্তি মানতে পারলুম না ; এবং আপনি যে-সমস্ত প্রামাণিক উক্তির উদ্ধার ক'রে যুক্তির দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন, তার অধিকাংশই আমার কাছে স্বতঃসিদ্ধ নয়, কোনো কোনোটা আবার বাগাড়ম্বর মাত্র। তাছাড়া আমার বিবেচনায় উষ্মা তর্কের পক্ষে হানিকর ; এবং স্থানে স্থানে আপনি রাগ সামলাতে পারেননি।

সে যাই হোক, আমি "সাহিত্যের ভবিষ্যৎ"-এর বহুল প্রচার কামনা করি। দলীয় মনোভাব তথা বালসুলভ অতিশয়োক্তি বাদ দিয়েও যে বামপন্থী সমালোচনা সম্ভব, তা বোধহয় আপনিই প্রথম দেখালেন অন্তত বাংলাদেশে। অবশ্য সেইজন্যেই বর্ত্তমান গ্রন্থ বামাচারীরা হয়তো পড়বেন না, অথবা পড়ার শেষে জানতে চাইবেন আপনার সাহিত্যাদর্শে সাম্যবাদের স্বাক্ষর কোথায়। সে-প্রশ্নের উত্তর তাঁদেরই দেয় ; আমি এটুকুই বলতে পারি বইখানি তাঁদেরই বিশেষ ক'রে পাঠ্য।

সময় পেলে একদিন আসবেন। বিকাল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা

সাতটা পর্য্যন্ত আমি প্রায়ই বাড়ি থাকি। তবু সে-দিনে আপনার সঙ্গে দেখা হলো না ভাগ্যদোষেই। ইতি ১৭ নভেম্বর

ভবদীয়

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৮'৭ই × ৫'৫ই মাপের সাদা কাগজে লেখা। কালি ফুরোবার পর নতুন কালিতে। সাল নেই, তবে 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ'এর (প্রকাশকাল : ১৯৫২) প্রাপ্তিস্বীকার আছে—তাই এখানেই রাখা হল।

৩৩

GRAMS : DAVALLEC PHONE : SOUTH 2840

DAMODAR VALLEY CORPORATION

ANDERSON HOUSE, ALIPORE

CALCUTTA 27

প্রিয়বরেষু,

বুদ্ধদেব বাবু মাইসোর থেকে আনুষঙ্গিক চিঠি পাঠিয়ে অনুরোধ করেছেন তার কপি যেন অবিলম্বে আপনার হস্তগত হয়। তাঁর ইচ্ছা আপনি আপনার কবিতার ইংরেজী অনুবাদ বা অন্য কোনো গদ্য রচনা এঁদের যথাসত্বর পাঠান।

আশা করি কুশলে আছেন। সময় পেলে এক দিন আসবেন। ইতি ৬।৫।৫৩

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৮'৯ই × ৫'৭ই। ১৯৪৯-১৯৫৪ সুধীন্দ্রনাথ ডি-ভি-সি-র প্রচার সচিব। বুদ্ধদেব বসু লেখা চেয়ে পাঠিয়েছেন সম্ভবত 'কবিতা'র 'আন্তর্জাতিক সংখ্যা'-র জন্য।

৩৪

DAMODAR VALLEY CORPORATION

[আগের চিঠির মতোই লেটারহেড]

প্রিয়বরেষু,

আপনার ১৮ তারিখের চিঠি পেয়ে খুব খুশী হয়েছি। বিকাল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত আমরা প্রায় রোজই বাড়ি থাকি;

আজকাল তার পরেও বেরোই কম। সুতরাং আশা করি শীঘ্রই এক দিন দেখা হবে—অবশ্য যদি টেলিফোন করে আসেন, তাহলে কোনো অনিশ্চয় থাকে না।

সে-দিন এসে আপনি ফিরে গিয়েছিলেন বলে আমরা সত্যই খুব দুঃখিত হয়েছিলুম। আশা করেছিলুম চিঠি পেয়ে হয়তো আবার আসবেন; নিশ্চয়ই সময়ের অভাবে পেরে ওঠেন নি।

সম্প্রতি বহু কষ্টে দুটো কবিতা লিখেছি—দুটোই বেরিয়ে গেছে, কবিতায় আর পূর্বাশায়। আমার অসংগৃহীত কবিতাকটা সংবর্ত নামে সিগনেট প্রেস থেকে শীঘ্রই প্রকাশ হবে।

আশা করি আপনাদের কুশল। ইতি ২১মে ১৯৫৩

ভবদীয়

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

আগের মতোই কাগজ। 'সংবর্ত'-তে ১৯৫৩-র মোট তিনটি কবিতা আছে। "বহু কষ্টে" লেখা যে-দুটি কবিতার কথা বলা হয়েছে, সে-দুটি সম্ভবতঃ 'দশমী' (১৮ মার্চ ১৯৫৩) এবং 'উন্মার্গ' (১৪ এপ্রিল ১৯৫৩)। তৃতীয়টি ('প্রত্যাবর্তন') এ-চিঠির দুদিন পরে লেখা (২৩মে ১৯৫৩)। 'সংবর্ত'-র প্রকাশকাল: জুন ১৯৫৩.

৩৫

৬নং সুইট্
৬ রাসেল্ স্ট্রীট
কলিকাতা ১৬
২॥৭॥৫৩

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুশী হয়েছি। সে-দিন আপনাকে 'সংবর্ত' পাঠানোর পরে আবিষ্কার করা গেল যে ৪২ পৃষ্ঠায় তিনটে মারাত্মক মুদ্রাকরপ্রমাদ আছে যার জন্যে প্রকাশক বা আমি সত্যই দায়ী নই। ওই ফর্মাটা আবার ছাপা হচ্ছে, নতুন কপি পেলে

আপনাকে পাঠাব। ইতিমধ্যে ভুল কপি কাউকে দেবেন না, এই প্রকাশকের অনুরোধ।

আশা করি আপনাদের কুশল।

ভবদীয়

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৮·৮ই × ৭ই সাদা কাগজে খুব ফাঁক ফাঁক বড় বড় করে লেখা। এর পরের দুটি চিঠির কাগজও এক।

৩৬

৬ নং সুইট

৬ রাসেল স্ট্রীট

কলিকাতা ১৬

প্রিয়বরেষু,

এলিয়টের অনুবাদ পেয়ে খুবই খুশী হয়েছি : আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

অনেকগুলি তর্জমার সঙ্গে আগেই আমার পরিচয় হয়েছিল ; কিন্তু আবার তথা একত্রে সবগুলি পড়তে পাওয়ার ফলে প্রত্যেকটির মর্যাদা যেন বাড়ল। ভাষান্তরের প্রয়োজনে চিত্রকল্পের যে-রূপান্তর আপনি করেছেন মাঝে মাঝে, তা প্রায় সর্বত্রই বিস্ময়কর রকমের সফল।

আশা করি কুশলে আছেন। সময় পেলে এক দিন আসবেন। ইতি ১২ অগস্ট ১৯৫৩

ভবদীয়

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

'এলিঅটের কবিতা'—প্রকাশকাল : আষাঢ় ১৩৬০ (জুন বা জুলাই ১৯৫৩) ; সিগনেট প্রেস।

৩৭

৬ নং স্যুইট,

৬, রাসেল স্ট্রীট,

কলিকাতা ১৬

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি যথাসময়ে পেয়ে খুশী হয়েছি : ধন্যবাদ।

"রাজর্ষিদের যাত্রা" আবার প'ড়ে দেখলুম— অবশ্য মূলের সঙ্গে না মিলিয়েই ; দুটো লাইন বাদ গেছে, তা মনে হলো না। সুতরাং উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। আর যে এক-আধটা ছোট-খাট বানান ভুল চোখে পড়েছে তা নিতান্ত তুচ্ছ ; এবং ক্বচিৎ ছন্দে আমার কান যদি সায় না দিয়ে থাকে, তাহলে এ-বিষয়ে আমার পুরনো ধারণাই নিশ্চয় দায়ী।

সংবর্তের সংশোধিত সংস্করণ পেয়েছি ; কিন্তু প্রথম মুদ্রণের প্রমাদ সম্পর্কে প্রকাশকের কুণ্ঠা আমি বোধহয় বাড়িয়ে দেখেছিলুম। সে যাই হোক, দেখা হলে আপনার কপি বদলে দেব। ইতিমধ্যে ১৯৪৫-শীর্ষক লেখাটার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকে নিম্নলিখিত সংশোধন করে নেবেন :

প্রথম স্তবক—"ভুক্তভোগী"-র পর দাঁড়ি বাদ দিতে হবে।

দ্বিতীয় স্তবকে "ভেদে"-র শুদ্ধ পাঠ ভেদ, এবং "বিশ্রুতি" ভুল, বিশ্রুত ঠিক।

আশা করি ভালো আছেন। সময় পেলে এক দিন আসবেন। বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত আমরা প্রায়ই বাড়ি থাকি। ইতি ১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩

ভবদীয়

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

'এলিঅটের কবিতা'-র ১ম সংস্করণে 'রাজর্ষিদের যাত্রা' কবিতার ১ম স্তবকের শেষ ২টি লাইন ("এদিকে কানে কানে গান করে দিবা কণ্ঠস্বর, তারা বলে,।এ সবই নির্বুদ্ধিতা") বাদ পড়ে গেছে। ২য় সংস্করণে (১৯৬০) সংশোধিত হয়েছে।

৬ নং স্যুইট
৬ রাসেল্ স্ট্রীট
কলিকাতা ১৬

প্রিয়বরেষু,

সিগনেট প্রেসের সৌজন্যে "নাম রেখেছি কোমল গান্ধার" ইতি-মধ্যেই হাতে এসে গেছে ; এবং গ্রন্থখানি তিন-চার বার প'ড়ে ফেলেছি। পুস্তকের অঙ্গসজ্জা—বিশেষত প্রচ্ছদপট—একেবারে অনবদ্য ; এবং এ-রকম সুদর্শন বাংলা বই আগে আর কখনও দেখে থাকলেও, মনে নেই। মানতেই হবে যে প্রকাশকেরা আপনার প্রতিভাকে যথোচিত সম্মান দিয়েছেন ; এবং উৎসর্গপত্রের তারিখই হয়তো প্রমাণ যে চিরক্রিয় ব'লে তাঁদের যে-দুর্নাম এত দিন শুনেছি, তা এ-বার তাঁরা খণ্ডালেন।

আপনার সৃজনীশক্তি সত্যই বিস্ময়কর, এবং অন্তত আমার পক্ষে ঈর্ষার বস্তু। এ-দিক থেকে আপনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয় ; এবং আমি যত দূর জানি, গত দশ-পনেরো বছরের মধ্যে অপর কোনও বাঙালী কবির লেখনী এমন অবাধে চলেনি। অবশ্য বর্তমান গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই আমার পূর্বপরিচিত ; কিন্তু সেগুলিকে একত্রে পেয়েই, বুঝলুম আপনার প্রেরণা কত স্বচ্ছন্দ ; এবং আমাদের দেশ ও কাল আপাতত যখন এবম্বিধ প্রাচুর্যের পরিপন্থী, তখন আপনার মত ও পথের গুণ না গেয়ে উপায় নেই।

কিন্তু আমার স্বভাব যেহেতু বিপরীত, তাই আপনার কাব্যাদর্শ আজও আমার কাছে অল্প-বিস্তর অস্পষ্ট ; এবং বুঝি বা সেই কারণেই এখনও আমার মনে হয় যেন আপনার পদ্ধতি ও প্রসঙ্গের মধ্যে কোথায় একটা বিবাদ আছে। নিজেকে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে দেখেও, আপনি কবিতার লেখার সময়ে যুক্তির সাধারণ্য ছেড়ে, ব্যক্তিগত অনুষঙ্গের আশ্রয় নেন ব'লেই, আমি এ-সন্দেহ উত্থাপন করছি না,

আমার বিচারে আপনার রচনারীতি যতটা সঞ্চারী, আপনার বক্তব্য ততখানি পরিণামী নয় ; এবং এখানেও আপনি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের সমধর্মী—ভাবের ধ্যানেই আপনার আনন্দ, ভাবনার প্রগতিতে আপনি অপেক্ষাকৃত উদাসীন।

বলতে পারি না তাই কি না, আমার বিবেচনায় আপনার কোনও কোনও দীর্ঘ কবিতার সংক্ষেপসাধন সম্ভব ; এবং ১২৮ পৃষ্ঠায় শেষের চার লাইন ও পরের পাতায় প্রথম তিন পংক্তি যদি বা সাঙ্গীতিক বিস্তারের কাব্যগত প্রয়োগ হয়, তবু ১০৭ পৃষ্ঠার "বিষাদের অভিজ্ঞ পুলকে ॥ যন্ত্রণার হর্ষে হর্ষে রোমাঞ্চিত", অথবা ৩৫ পৃষ্ঠার "খুঁজি সাধারণো তাকে সাধারণে জনতায় জনগণে জনসাধারণে", অন্তত আমার মতে, অনাবশ্যক পুনরুক্তি। কয়েকটি ভাবচ্ছবি-সম্বন্ধেও আমার অনুরূপ অভিযোগ আছে ; এবং হাওয়া, আকাশ, পাহাড়, সমুদ্র, আশ্বিন, আষাঢ় ইত্যাদির পৌনঃপুন্য আমার কাছে যৎকিঞ্চিৎ ক্লান্তিকর ঠেকেছে।

আবার অন্যত্র—যেমন আপনার বহুলাঙ্গ কবিতাগুলিতে—অবয়বসমূহের সংযোগ সুপ্রকট নয় ; এবং কোথাও কোথাও এমন অনুমান অনিবার্য যে অন্যোন্যবিলগ্ন রচনাবলীর উপরে আপনি অকারণে একই নাম জুড়ে দিয়েছেন। আসলে আপনার নামকরণ অনেক সময় অর্থগ্রহণের সহায় নয়, অন্তরায় ; এবং "অক্টোবর দিনগুলি" যে পৌর্বাপর্য বিরহিত দিনলিপি, তা বুঝতে দেরি লাগে ওই নামের দোষেই! উক্ত অনৈক্যের প্রতিবিধানকল্পেই আপনি বোধহয় শুধু বিরামচিহ্নের ব্যবহারে নয়, অন্বয়ের প্রতিও বিমুখ ; এবং তৎসত্ত্বেও যাদের মন আমার মতো গদ্যধর্মী, তাদের কাছে আপনার অনেক কবিতা খণ্ড খণ্ড ভাবে উপভোগ্য।

আপনার ছন্দঃপ্রকরণেও স্বেচ্ছাচার রয়েছে ; এবং কার্যত, সনাতন না হোক, উত্তরভারতচন্দ্রীয় নিয়ম মেনে চললেও, রবীন্দ্রনাথই যদিচ পয়ারকে স্থিতিস্থাপক বলেছিলেন, তবু অক্ষরবৃত্তের উক্ত

সুবিধাবাদ বাংলা উচ্চারণের বিধিপালনে নিশ্চয়ই বাধ্য। কিন্তু আপনার কোনও কোনও পর্বে 'কিম্বা' 'কিন্তু' ইত্যাদি তো কিম্-বা, কিন্-তু রূপে পাঠ্য বটেই, এমনকি 'সমুদ্র'-এর পাঠও হয়তো সমুদ্-র এবং এ-ধরণের অস্বাভাবিক উচ্চারণ যে মাত্রাচ্ছন্দেও বর্তমান, তার অন্যতম নিদর্শন সম্ভবত ৭৮ পৃষ্ঠার "একই মাটি জল একই নীলাকাশ—"। আক্ষরিক ছন্দেও, ৫১ পৃষ্ঠার "যম-ও"-এর মতো, "একই" ত্রিমাত্রিক ৮১ পাতার "একই অমৃতপুত্র সহোদর আত্মীয় পালন"—এই পংক্তিতে ; এবং আমি যতদূর বুঝেছি, তাতে এমন পাঠ কেবল ছন্দোরক্ষার খাতিরে, যেমন বহু স্থলে "না", "নি"-র পরে "কো"-র ব্যবহার।

ফলত আপনার যতিস্থাপনা মাঝে মাঝে খামখেয়ালী ; এবং যেমন পয়ারে তার অন্যতম দৃষ্টান্ত "মেলে না পার্বতীপর ॥ মেশ্বরে এ ॥ বেতাল গাজনে [”] (৯৪ পৃষ্ঠা), তেমনই মাত্রাচ্ছন্দে তার উদাহরণ "প্রাকৃতিক ও অ ॥ মানুষিক [”] (২১ পৃষ্ঠা)। ছন্দের সাধারণ প্রবাহে অপ্রত্যাশিত ছেদ শব্দবিশেষের উপরে জোর দিয়ে, অবশ্য অর্থগৌরব বাড়াতে পারে ; এবং ১২৩ পাতার "তোমারই লা ॥ বণ্য যে ॥ বিতরে" যদি বা সেই উদ্দেশ্যে লেখা হয়ে থাকে, তবু "প্রতিমা তোমার হোক প্র ॥ তীক আ ॥ রেক" (৯৩ পৃষ্ঠা) হয়তো অনুরূপ অভিপ্রায়ে বঞ্চিত। পক্ষান্তরে "পূর্ণিমার চাঁদের মতো প্রত্যক্ষ অথচ" (৩৫ পৃষ্ঠা) প্রাকৃত, অপ্রাকৃত কোনও স্থিতিস্থাপকতার সাহায্যে, অন্তত আমার দ্বারা, পদ্য হিসাবে পাঠ্য নয় ; এবং "রৌদ্রে জলে জ্যোৎস্নায় হাওয়ায় সংগঠিত"—৬৫ পাতার এই পদে 'হাও-য়ায়'এর উচ্চারণবিকৃতি ১২২ পৃষ্ঠার "চাহনিতে ছোটে আলো সও-য়ার"-এর সঙ্গে তুলনীয়।

বর্তমানে গুরুচণ্ডাল রচনারীতি যদিও কোনও বাঙালী কবির নিজস্ব নয়, তবু "সমুদ্রের গন্ধবহ হাতছানি" (৮২ পৃষ্ঠা) আজও কেমন যেন বেসুরো শোনায় ; এবং 'আইনসঙ্গত' আর আমাদের

কানে লাগে না বটে, কিন্তু ১৮ পৃষ্ঠায় "নির্চেরাগ" শব্দ আপনি দীপ-হীন বা নিরালোক অর্থে ব্যবহার ক'রে থাকলে, তাতে কেবল সন্ধি-বিধিরই ব্যতিক্রম ঘটেনি, বাংলা শব্দনির্মাণের সাধারণ নিয়মও এই জন্যে উপেক্ষিত হয়েছে যে এখানে উর্দু-ফারসি-র 'বে' উপসর্গ অনায়াসে লাগানো যেতে পারত। পক্ষান্তরে বিশেষণে স্ত্রিলিঙ্গবর্জন আধুনিক বাংলায় খুবই চলে ; অথচ ১১৬ পৃষ্ঠায়, আপাতত মিলের প্রয়োজনে, আপনি পুংলিঙ্গ প্রহরীর আখ্যা দিয়েছেন নিদ্রাহীনা ; এবং এতাদৃশ ব্যাকরণদোষের এইটাই একমাত্র সাক্ষ্য নয়।

আপনার আর আমার উপলব্ধি মূলেই আলাদা ব'লে, উক্তির খুঁটি-নাটি নিয়ে এত সময় কাটালুম ; কিন্তু এ-কথা মানাও আমার পক্ষে অসম্ভব যে কার্যগতিকে দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির যে-চেহারা আমি দেখেছি, তার সঙ্গে আপনার অভিজ্ঞতা খাপ খায় না, আমি যেহেতু শ্রেণী-স্বার্থের দ্বারা অন্ধ, সেই জন্যে ; এবং মার্ক্স্‌বাদের প্রভাবে বা অভাবে দৃষ্টিভঙ্গী যতই বদলাক না কেন, তাতে যদি বস্তুজগতেরও রূপান্তর ঘটে, তবে আপনার আমার বাক্যালাপ নিতান্ত পণ্ডশ্রম। অগত্যা আমি ভাবতে বাধ্য যে আপনার বক্তব্য আদ্যন্ত অনুভূত নয় ; এবং তাই বুঝি আপনার কাছে বনস্পতি উপমা আর দিউগাশভিলি উপমান (৩০ পৃষ্ঠা)।

সে যাই হোক, বিশ্বাসগত বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও যে এ-বইয়ের অনেক কবিতা তথা অসংখ্য পংক্তি আমাকে চমৎকৃত করেছে, তা আপনার অবিসংবাদিত কবিপ্রতিভার কল্যাণে ; এবং সেই জন্যেই অন্যত্র যদি আমার অবিশ্বাস অন্তত সাময়িক ভাবেও না ঘুচে থাকে, তবে আপনিই দায়ী। অবশ্য আমার বিদ্যা-বুদ্ধির পরিমাণ বেশী হ'লে, আপনার একাধিক ইঙ্গিত-উল্লেখ আমাকে এড়িয়ে যেত না ; কিন্তু আমার শিক্ষা-দীক্ষার দৈন্য ঘুচলেও, আমি "নাম রেখেছি কোমল গান্ধার"-এর প্রত্যেক "তুমি"-কে চিনতে পারতুম কিনা সন্দেহ ; তার কারণ এক দিকে যেমন এই যে আপনি তাদের পরিচয়প্রকাশে অনিচ্ছুক,

তেমনই অন্য দিকে এমন মনে করাও হয়তো নিতান্ত অন্যায় নয়· যে আপনি তাদের পরিচয় এখনও পূরোপুরি পাননি ব'লেই, আপনার কাব্যে তাদের স্বাতন্ত্র্য অনুপস্থিত।

এই অযাচিত চিঠির বেয়াদবি মাপ করবেন। বর্তমান পুস্তকের বহু লেখাই আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে, এইটাই বড় কথা; এবং এইটুকু বললেই যথেষ্ট হতো। কিন্তু গত বারে ততোধিক লিখিনি ব'লে, আপনার কাছে বকুনি খেয়েছিলুম; এবং তাই এ-বারে কোমর বেঁধে লেগে গেছি "সমালোচনা"-য়। কিন্তু আমি জানি যে এমন কোনও লেখক নেই যার ছিদ্রান্বেষ শক্ত: সৃজনীপ্রতিভাই দুর্লভ; এবং আপনার মধ্যে সেই অলৌকিক শক্তির প্রাদুর্ভার [প্রাদুর্ভাব] আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয়—বিশেষত আমার, কারণ আমি উক্ত ক্ষমতায় বঞ্চিত। উপরন্তু উল্লিখিত স্খলন-পতন-ত্রুটির প্রত্যেকটাই আমাতে স্পষ্টতর; এবং হয়তো সেই জন্যেই সেগুলির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ। ইতি ১৭ অক্টোবর ১৯৫৩

স্নেহার্থী

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পুঃ—চিঠি ডাকে দেবার আগে শুনলুম আপনি পূজার বন্ধে কলকাতার বাইরে গেছেন, সম্ভবত দেওঘরে। আর এক বার আগে আপনার কোন্ বই সম্পর্কে আমার একখানা চিঠি অনুরূপ অবস্থায় মারা গিয়েছিল; এবং এখানা লিখতে যেহেতু বেশ খানিক ক্ষণ সময় গিয়েছে, তাই এটা রেজিস্ট্রি ক'রে সোমবার পাঠাব আপনার এখানকার ঠিকানায় [।]

৮·৯ই × ৬·৮ই ঘন নীল কাগজে ৬ পৃষ্ঠা ঠাসা লেখা—খুব যত্ন করে। কলকাতার ঠিকানায় পাঠানো এই রেজিস্ট্রি-করা চিঠিটি দেওঘরের ঠিকানায় রি-ডাইরেক্ট করে পাঠানো হয়। বিষ্ণু দে তখন দেওঘর পোস্ট-অফিসের অন্তর্গত রিখিয়ায়। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'—প্রকাশকাল ১৩৬০ (সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর ১৯৫৩)।

৬নং সুইট
৬ রাসেল স্ট্রীট
কলিকাতা ১৬

প্রিয়বরেষু,

আপনার ২৩ তারিখের চিঠি কাল সন্ধ্যায় হাতে এসেছে ; এবং আজ সকালেই তার জবাব লিখতে বসেছি দেখে, বুঝবেন সে-পত্র আমাকে কতখানি আনন্দ দিয়েছে। আমার সমালোচনা আপনার কাছে একেবারে অমান্য নয় জেনে বিশেষ আশ্বস্ত হলুম। কারণ আপনার কবিপ্রতিভায় ভরসা রাখি ব'লেই, আপনার কাছে আমি চাই অনবদ্য রচনা ; এবং আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে অতঃপর আপনি যদি প্রসঙ্গের স্বয়ত্তশাসন [স্বায়ত্তশাসন] মেনে নিয়ে, প্রকরণের স্বৈরাচার নির্দয়ে নিবারণ করেন, তাহলে আপনার কাব্য ধর্মাধর্ম-নির্বিচারে পাঠকসাধারণের সমর্থন পাবে।

অবশ্য আমার প্রতিবিপ্লবী রাষ্ট্রনীতিই আপনার-আমার মধ্যে অন্যতম বাধা। কিন্তু এলিয়টের খৃষ্টানিও তো আমার স্বভাব তথা সংস্কৃতির বাইরে ; এবং তৎসত্ত্বেও তাঁর লেখা যখন অন্তত সাময়িক ভাবে শিরোধার্য, তখন আপনার সাম্যবাদই বা আমার অবিশ্বাস্য কেন ? এ-প্রশ্নের একটা একদেশদর্শী উত্তর বোধহয় এই যে লেখক হিসাবে যুক্তির সাধারণ্যে আপনি বীতশ্রদ্ধ ; এবং সম্ভবত তাই "নদীর উৎস যদি জানা থাকে"-র মতো তর্কাতীত কবিতাতেও এ-কথা আপাতত অস্বীকার্য যে উৎসের সঙ্গে পরিচয় থাকলে, মহানা [মোহনা] পর্যন্ত নদীর দেশকালগত বিস্তার আমাদের অবগত।

বনস্পতিতে দিউগাশভিলি, আপনার মতে, সত্য সত্যই উপমেয়—এবাক্যের অর্থ কী, তা ধরতে পারলুম না ; এবং সেই জন্যেই আপনার স্বীকারোক্তি শুনেও, আমার সন্দেহ গেল না যে এখানে উপমা-উপমানের স্থান-বিপর্যয় পুরা কালে যার নাম ছিল "প্যাথেটিক্

ফ্যালাসি", সেই ভ্রান্তিরই অত্যাধুনিক উদাহরণ। অবশ্য অত্যাসক্তির ফলে অনেক কবিই প্রেয়সীর—বিশেষত অন্তর্হিত প্রেয়সীর—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষাৎ পেয়েছেন জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে। কিন্তু বর্তমান দৃষ্টান্তে এমন কোনও ইঙ্গিত নেই যে এ-উপমান আপনার কাছে ঠিক তেমনই ব্যক্তিগত ভাবে প্রিয়; এবং উপযোগী প্রস্তুতির অভাববশত উপসংহারে পৌঁছে পাঠকের অবিশ্বাস মায়ানিদ্রায় ঝিমিয়ে যায় না, বরঞ্চ তার প্রতিবাদ জাগে।

আমার বক্তব্য ঠিক গুছিয়ে লিখতে পারছি না এখন; কাজেই মিছি মিছি এ-চিঠি আর বাড়াব না: সুবিধা পেলে, সাক্ষাতে একদিন বিষয়টার আলোচনা করা যাবে। ইতিমধ্যে মনে রাখবেন যে আমি আপনার ভক্ত ব'লেই, বারে বারে আপনার দোষ ধরছি; এবং আপনার লেখা যদি সনাতনী হতো, তাহলেই এক কথায় তাকে ভালো বা মন্দ বলা চলত, আপনার কাছে কোনও কৈফিয়ৎ চাওয়ার প্রয়োজন বা অবকাশ থাকত না। অর্থাৎ আপনার কাব্য আমার কাছে জিজ্ঞাসার বস্তু; এবং নিশ্চিন্ত সাধুবাদ কোনও পথিকৃতের প্রাপ্য তো নয় বটেই, এমনকি তাঁর প্রতি অশ্রদ্ধাপ্রকাশের প্রকৃষ্টতর উপায়ও আর নেই।

আশা করি আপনারা সকলে কুশলে আছেন, এবং দেওঘরের আবহ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল। আমাদের খবর মন্দ নয়। আমার হাতে লেখা কোথায় যে সাহিত্য পত্রে পাঠাব? ইতি ২৮ অক্টোবর ১৯৫৩

ভবদীয়

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৩৫ নং চিঠির মতো কাগজ। ঠাসা লেখা। খামে "P. O. Rikhia|Dooghari, S. P" ঠিকানা লেখা। 'নদীর উৎস যদি জানা থাকে'—'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' গ্রন্থবই একটি কবিতা।

DAMODAR VALLEY CORPORATION

[৩৩ নং চিঠির মতোই লেটারহেড]

প্রিয়বরেষু,

আপনার ২৬ তারিখের চিঠি পেয়ে বিশেষ অনুগৃহীত হলুম। লোকমুখে শুনেছিলুম যে গ্রীষ্মের বন্ধে আপনি সপরিবারে কলকাতার বাইরে গেছেন। তাই "অর্কেস্ট্রা"-র দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠাইনি এত দিন।

যে কেউ পুরস্কার দিক, সেটা নিশ্চয়ই গৌরবকর। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা ওই উপলক্ষে আপনার সাদর সম্ভাষণ। সেজন্যে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ নেবেন। আমার মায়ের মৃত্যুতে আপনার সমবেদনা পেয়েও আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

আমার স্ত্রী অনেকটা সেরে উঠেছেন; কিন্তু এখনও সব সময়ে তাঁকে মুখে ওষুধ লাগিয়ে রাখতে হয়: তাছাড়া উত্তরবেগুনী আলোও এক দিন অন্তর দেওয়া হচ্ছে।

ধূর্জ্জটির ঠিকানা: ৩৭নং ল্যান্স্ডাউন্ রোড, একতলার ফ্ল্যাট। তার সঙ্গে মাত্র একবার দেখা হয়েছে এ পর্যন্ত।

আশা করি আপনারা ভালো আছেন। সময় পেলে আসবেন একদিন। ইতি ২৮ মে ১৯৫৪

ভবদীয়

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৯·৮ই × ৮ই। বিষ্ণু দে ১৯৫৪-তে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত রিখিয়ায় ছিলেন, সেখানে আর যান নি। 'অর্কেস্ট্রা'-র ২য় সংস্করণ বেরোয় মার্চ ১৯৫৪-য় (সিগনেট)। সুধীন্দ্রনাথের মা—ইন্দুমতী বসু মল্লিক (দত্ত)। সুধীন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া স্ত্রী রাজেশ্বরীর এ-সময়ে নাকি "মুখে ব্রণ বা purples হয়েছিল"।

৪১

DAMODAR VALLEY CORPORATION

[আগের চিঠির মতোই লেটারহেড]

প্রিয়বরেষু,

আপনার ৭ তারিখের চিঠি পেয়ে এত ভালো লেগেছে যে সে-বিষয়ে বাক্যব্যয় করলে অতিশয়োক্তির মতো শোনাবে। অর্কেস্ট্রার সকল সংশোধন গ্রাহ্য কিনা, সে-সম্বন্ধে আমার নিজেরও সন্দেহের অন্ত নেই। কিন্তু মোটের উপর দ্বিতীয় সংস্করণটা আপনাকে উত্তেজিত করেছে জেনে যৎপরোনাস্তি আশ্বস্ত হলুম: এর চেয়ে বেশী পুরস্কার কোনও লেখকেরই প্রাপ্য নয়। আপনাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ধূর্জটির মুখে যে খবর রটে তার যাথার্থ্য মেনে নিলে বিপদে পড়বেন। সে যাই হোক, কাল সন্ধ্যায় দামোদর ভ্যালি থেকে ফিরেছি। এক সামনের শনিবার ছাড়া প্রায় যে-কোনও দিন সন্ধ্যায় এলে আমাদের পাবেন। অবশ্য পারলে টেলিফোন্ ক'রে আসবেন। তাহলে আকস্মিকের উৎপাতও সইতে হবে না।

আশা করি আপনাদের সর্বাঙ্গীণ কুশল। তাহলে এবারে গ্রীষ্মাবকাশে আর বাইরে গেলেন না? ইতি ১০ জুন ৫৪

ভবদীয় সুধীন্দ্র

আগের মতোই কাগজ। ১৯৫৪-তে সত্যিই শেষপর্যন্ত বাইরে যান নি ও রা।

৪২

৬নং সুইট

৬ রাসেল স্ট্রীট

কলিকাতা ১৬

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠিতেই প্রথম জানলুম যে স্টিফন্ স্পেণ্ডর কলকাতায় আসছেন। কার কাছে খোঁজ করলে, তিনি কোথায় থাকবেন, তার

খবর মিলবে, তা ভেবে পাচ্ছি না। এক বার ব্রিটিশ কাউন্সুলে টেলিফোন করে দেখুন না। বুদ্ধদেবও আজকাল বিদেশীদের সন্ধান রাখেন, এবং মনে হচ্ছে তাঁর সঙ্গে স্পেণ্ডরের ব্যক্তিগত পরিচয় আছে।

আশা করি আপনাদের কুশল। পুজোর ছুটি কেমন কাটল? সময় পেলে একদিন আসবেন। আপনার সঙ্গে অনেক কাল দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। ইতি ১২ নভেম্বর ১৯৫৪

ভবদীয়

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৬·৮ই×৫·২ই হাল্‌কা নীল রঙের কাগজ। স্পেণ্ডর সম্ভবত ১৯৫৪-তে কলকাতায় আসেন নি—এসেছিলেন ১৯৬০-এ।

৪৩

৬নং সুইট

৬ রাসেল স্ট্রীট

কলিকাতা ১৬

প্রিয়বরেষু,

আপনার ১ তারিখের পোস্টকার্ড যথাসময়ে পেয়েছি। আপনার অসুখের কথা সে-দিন আশীষ বর্মণের কাছ থেকে শুনলুম। আশা করি এত দিনে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

হাম্‌ফ্রির মৃত্যুসংবাদ হপ্তাখানেক আগে অপূর্বর মুখে প্রথম শুনি। পরে আর এক জন লোকও একই খবর দিয়েছেন। কী হয়েছিল জানি না; সম্ভবত হার্ট্‌ ফেল্‌—সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক। তার কাছে ব্যক্তিগত ভাবে আমি অনেক পেয়েছি; পরিবর্তে কিছুই দিতে পারিনি। তাই বন্ধুবিয়োগের শোক অপরিশোধিত ঋণের ভারে আরও দুঃসহ হয়ে উঠেছে।

সোমবার দিন কাজে দিল্লী যেতে হচ্ছে দিন-দশেকের জন্যে ফিরে এসে আশা করি দেখা হবে। ইতি ৪ মার্চ ১৯৫৫

স্নেহার্থী

সুধীন্দ্র

৮'৭ই × ৬'৯ই সাদা পাতলা ব্যাঙ্ক-পেপারে লেখা। হাম্‌ফ্রি হাউস—Humphrey House।

৪৪

৬নং স্যুইট্

৬ রাসেল্ স্ট্রীট

কলিকাতা

প্রিয়বরেষু,

সোমবার দুপুরে ফিরেছি। এসেই আপনার চিঠি পেলুম। এখান থেকে যাবার সময় আপনি কলকাতায় ছিলেন না; তাই দেখা ক'রে যেতে পারিনি। কিন্তু আপনার খবর পেয়েছিলুম প্যারিসে চঞ্চলের কাছে।

সে যাই হোক, কবে দেখা হবে? বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত রোজই বাড়িতে পাবেন। আপনার সুবিধা হলে, আপনিই আসুন। নচেৎ আমি শীঘ্রই একদিন আপনাদের ওখানে যাব।

আশা করি "শ্রেষ্ঠ কবিতা"র যথোচিত সমাদর হয়েছে, এবং বইখানি ভালো বিক্রি হচ্ছে। লিখছেন তো? ইতি ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬

স্নেহার্থী

সুধীন্দ্র

আগের মতোই কাগজ। ১৯৫৫-৫৬তে সুধীন্দ্রনাথ ইওরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে যান। ফিরে এসেই এই চিঠিটি লিখছেন। চঞ্চল—চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়। "শ্রেষ্ঠ কবিতা"—'বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২, জুন ১৯৫৫)।

৪৫

৬নং স্যুইট্‌
৬ রাসেল স্ট্রীট
কলিকাতা ১৬

প্রিয়বরেষু,

বোধহয় শ্রীযুক্ত বিরাম মুখোপাধ্যায়ের অনুগ্রহে আপনার শ্রেষ্ঠ কবিতা আর অমিয় চক্রবর্তীর পালাবদল কয়েকদিন আগে হাতে এল। প্রেরককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবেন দয়া ক'রে। নাভানার ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ প্রায় অনবদ্য—এঁরা বাংলাদেশের বিশেষ উপকার করছেন, এবং সর্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ।

শ্রেষ্ঠ কবিতা খুব ভালো লাগল। অধিকাংশ লেখার সঙ্গে আমি আগে থেকেই পরিচিত; কিন্তু তাদের একসঙ্গে পেয়ে প্রত্যেকের গুণ যেন বেশী ক'রে ধরতে পারছি। মনে হলো স্তূপীকরণের ফলে কয়েকটার তেজ আরও বেড়েছে।

আশা করি ভালো আছেন সপরিবারে। সময় পেলে একদিন আসবেন। ইতি ৩১ মার্চ ১৯৫৬

ভবদীয়
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

খামটি The Indian Institute of Public Opinion নামাঙ্কিত। সুধীন্দ্রনাথ ১৯৫৪-৫৬ পর্যন্ত ঐ সংস্থার কলকাতা শাখার পরিচালক ছিলেন। অমিয় চক্রবর্তীর 'পালাবদল'-এর প্রকাশকাল: জুলাই ১৯৫৫ (নাভানা)।

৪৬

৬নং স্যুইট
৬ রাসেল স্ট্রীট
কলিকাতা ১৬

প্রিয়বরেষু,

"দশমিক" খুব ভালো লাগল। দ্বিতীয় পংক্তির উপান্তে দীর্ঘ বর্ণে যে-বৈচিত্র্য সূচিত হয়েছে, সারা কবিতাটির ভাবে তার সমর্থন

আছে। অনন্যায় আর কন্যায় মিল চমৎকার; এবং শেষ স্তবকের ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমার খটকা থেকে গেলেও, অর্থ বোধহয় স্পষ্ট।

বোধহয় বললুম এই জন্যে যে সমস্ত কবিতাটিতে আপনার বক্তব্য কি তা আমার কাছে এখনও পরিষ্কার নয়। কিন্তু মনে হচ্ছে আপনি যেন বলতে চান যে দেশ-কাল থেকে মানুষের মুক্তি নেই। ঠিক কথা। কিন্তু এই দুর্জ্জেয় দেশ-কালকেই আমাদের ছেলে বেলায় দার্শনিকেরা বোধহয় স্পীশস্ প্রেসেন্ট নামে সম্বোধন করতেন, এবং তার সঙ্গে সোহংবাদের সম্পর্ক সম্ভবত অকাট্য।

আমার কাছে লেখা কৈ যে সাহিত্য পত্রে পাঠাব? এবং নূতন লেখার সম্ভাবনা দূরে থাক, অবকাশও নেই। "স্বগত" ও অন্যান্য বিক্ষিপ্ত রচনার ঘষা-মাজায় নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাচ্ছি না। তাছাড়া দুটো দীর্ঘ ইংরেজী প্রবন্ধ অবিলম্বে লিখে দেওয়ার জন্যে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

অবশ্য সেই সঙ্গে এ-কথাও স্মরণীয় যে সাহিত্য পত্রের পথ আর আমার মত একেবারে বিপরীত; এবং এ-দুইয়ের মধ্যে আপোষের চেষ্টাও হাস্যকর।

সে যাই হোক, আশা করি আপনারা সকলে কুশলে আছেন। সময় পেলে একদিন আসবেন। ইতি ৫ জুলাই ১৯৫৬

ভবদীয়

সুধীন্দ্র

'দশমিক'—বিষ্ণু-দে-র 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ' গ্রন্থের কবিতা। 'স্বগত' গ্রন্থের ২য় সংস্করণই (বাং ১৩৬৪, ১৯৫৭, সিগনেট) এখানে আলোচিত। ইংরেজি দীর্ঘ প্রবন্ধ—১৯৫৭ সালে লিখিত বলে চিহ্নিত হয়ে আছে তাঁর Calcutta প্রবন্ধ: অসমাপ্ত আত্মজীবনী The World of Twilight-এর নীচেও তারিখ ১৯৫৭। এর পর ১৯৬০ সালে তিনি আরো দুটি ইংরেজি প্রবন্ধ লেখেন—Tagore as a Lyric Poet এবং Hugo and others।

৬নং সুইট
৬ রাসেল স্ট্রীট [স্ট্রীট]
কলিকাতা ১৬

প্রিয়বরেষু,

আপনার ৩০ তারিখের চিঠি পেয়ে খুব খুশী হলুম। না মেনে উপায় নেই যে লোকমুখে শুনেছিলুম "চোরাবালি" সম্পর্কে আমার প্রবন্ধে যেটুকু বিরূপ সমালোচনা আছে, তা আপনার ভালো লাগেনি; এবং সে-জন্যে আপনার এক-আধ জন অন্তরঙ্গ আমাকে যেমন তিরস্কার করেছিলেন, তেমনই আপনার কোনও কোনও লেখা প'ড়ে মনে হয়েছিল যে জনবর [জনরব] হয়তো একেবারে অমূলক নয়। জেনে সত্যই আশ্বাস-বোধ করছি যে ব্যাপারটা আমারই মন-গড়া; এবং এর পরে ভুল বোঝার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা আমার অবশ্য কর্তব্য।

কিন্তু সাহিত্য পত্রের পথ আর আমার মত বিপরীত বলেছি ব'লে আপনি দুঃখিত হলেন কেন? এ-কথা নিশ্চয়ই কপোলকল্পিত নয় যে সাহিত্য পত্র শুধু মার্ক্স্ নয়, স্টলিনের [স্টালিনের] প্রতিও আস্থাবান। এবং আমার স্টালিন্‌বিদ্বেষ বরাবর উগ্র। অবশ্য আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন একদা আমি মুখে মার্ক্স্-ভক্তি দেখাতুম না কি? নিশ্চয়ই দেখাতুম; এবং অনেক দিন পর্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল যে মার্কসের তত্ত্ববিদ্যা তাঁর ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক মতের সংস্পর্শবর্জিত। পরে ভেবে দেখেছি আমার চক্ষে রুষ রাষ্ট্রের, তথা সে রাষ্ট্রের অনুরাগী যাঁরা তাঁদের, আচার-ব্যবহার মার্ক্সীয় তত্ত্ববিদ্যারই ফলাফল।

এই বিশ্বাসের মূলে আমার শ্রেণীস্বার্থ থাকতে পারে; কিন্তু জ্ঞানত এতে কোনও মিথ্যা নেই। উপরন্তু আমি মনে করি যে বিপরীত বিশ্বাসের জন্যে বর্তমান সমাজ অত্যন্ত বিপন্ন। অতএব এই দুই অন্যোন্যবিরোধী মতের ঐক্য আমার বিবেচনায় অসম্ভব;

এবং আমার বিশ্বাসে আমি যেহেতু কদাচিৎ অবিশ্বাসী নই, তাই তথাকথিত শুদ্ধ সাহিত্যের সাধনায় সে-বিশ্বাসের উপেক্ষা আমার পক্ষে অসাধ্য। তাছাড়া নিজেকে নিরতিশয় একদেশদর্শী ব'লে জেনেও আমি লিখিত বাদানুবাদের পক্ষপাতী নই; এবং বামপন্থী পত্রিকায় এই রকম দলাদলি আমাকে সন্ত্রস্ত করে।

আশা করি আপনাদের কুশল। সময় পেলে, এক দিন আসবেন। ইতি ৩১ জুলাই ১৯৫৬

ভবদীয়

সুধীন্দ্র

'চোরাবালি' সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি প্রথমে 'চোরাবালি' গ্রন্থের ১ম সংস্করণে (ভারতী ভবন, ১৯৩৭) "মুখবন্ধ" হিসেবে, পরে ঈষৎ পরিবর্তিত ভাবে 'স্বগত' গ্রন্থের ১ম সংস্করণে (ভারতী ভবন, ১৯৩৮ বা ৩৯) এবং আরো পরে 'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থে (সিগনেট, ১৯৫৭) প্রকাশিত হয়।

৪৮

৬নং সুইট

৬ রাসেল স্ট্রীট

কলিকাতা ১৬

প্রিয়বরেষু,

"হে বিদেশী ফুল" পেয়ে বিশেষ খুশী হয়েছি: ছাপা ও বাঁধাই লোভনীয়; এবং আপনার সৃজনী শক্তির প্রাচুর্য সত্যিই বিস্ময়কর। কোনও কোনও লেখা এখানে ওখানে আগে দেখেছি; কিন্তু অধিকাংশই—কী মূল, কী অনুবাদ—আমার কাছে নূতন এবং আপনার বিরাট পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। আপনার কাছে বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতা বেড়েই যাচ্ছে।

আশা করি কুশলে আছেন, এবং পুজোর ছুটি আনন্দে কেটেছে। সময় পেলে এক দিন আসবেন। ইতি ৩০ অক্টোবর ১৯৫৬

ভবদীয়

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৬ই'৯×৫'৩ই ধূসর বর্ণের কাগজ। 'হে বিদেশী ফুল'—প্রকাশকাল: আশ্বিন ১৩৬৩, ১৯৫৬ (বাক)। অনুবাদকবিতার সংকলন।

৪৯

46, Draycott Place
London, S. W. 3.

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্কট্‌ল্যাণ্ড্‌ যেতে হয়েছিল; এবং ফিরে এসে অবধি দেশে যাওয়ার বন্দোবস্তে একেবারে অভিভূত হয়ে আছি। সেই জন্যে জবাব দিতে এত দেরী; আশা করি অপরাধ নেবেন না।

জয়ন্তীউৎসবের কথা শুনে উৎফুল্ল হলুম, যদিও তাতে যোগ দিতে পারলুম না ব'লে খারাপ লাগছে। সম্বর্ধনাপুস্তকে "চোরাবালি"-সম্পর্কিত আমার লেখাটা গেলে আমারই গৌরব বাড়বে। কিন্তু সেটার অসম্পূর্ণতা তথা আরও অনেক দোষ সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিত। তৎসত্ত্বেও সম্পাদকেরা সে-রচনা যদি ছাপতে চান, তাহলে আমার কিছু বলার নেই। তবে বোধগম্যতার দিক দিয়ে তার দ্বিতীয় সংস্করণ—যেটা আমার "কুলায় ও কালপুরুষ" নামক প্রবন্ধ-সঙ্কলনে মুদ্রিত হয়েছে—অপেক্ষাকৃত ভালো; এবং সেই পাঠ বর্তমানে গ্রাহ্য। আমরা কলকাতা পৌঁছব ৩০ সেপ্টেম্বর; আগে বইখানা যদি না বেরিয়ে যায়, তাহলে একটা প্রুফ পেলে আরও সংশোধনের চেষ্টা করব।

আশা করি আপনার শারীরিক, মানসিক ও পারিবারিক কুশল। আমরা ভালো আছি, যদিও গত ছ সপ্তাহ ধরে লণ্ডন কলকতার [কলকাতার] মতো গরম; এবং বার্ধক্যের গুণে অনেক কিছুই সয়ে গেলেও তাপে আজকাল অস্থির হয়ে পড়ি। ইতি ১০ অগাস্ট ১৯৫৯

স্নেহার্থী সুধীন্দ্র

[চিঠির ওপরে ঠিকানার ডান দিকে পাশ-করে লেখা]

নতুন বই কখানির খবরে খুব খুশী হলুম ; সঙ্গে সঙ্গে হিংসাও কিছু কম হচ্ছে না। ধন্য আপনার সৃজনী শক্তি।

ইংল্যাণ্ড থেকে পাঠানো নীল এয়ার-লেটারে লেখা চিঠি। ১৯৫৭-৫৯-এ সুধীন্দ্রনাথ শেষ বারের মতো বিদেশে কাটিয়ে আসেন। ফেরার আগে এই চিঠি লেখেন। "জয়ন্তী উৎসব"—বিষ্ণু দে-র ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে উৎসব ও "সম্বর্ধনা পুস্তক" প্রকাশের আয়োজন হয়েছিল। অবশ্য শেষপর্যন্ত পুস্তকটি বের হয় নি। "নতুন বই কখানির খবর"—ঠিক আগের বছরই (১৯৫৮) বিষ্ণু দে-র নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বেরোয় : কাব্যগ্রন্থ—'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ', 'আলেখ্য' ; প্রবন্ধগ্রন্থ—'এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য', 'The Paintings of Rabindranath Tagore' (পুস্তিকা) ; অনুবাদ —'মাও ৎসে তুং। আঠারোটা কবিতা'।

৫০

৬নং সুইট্
৬ রাসেল স্ট্রীট্
কলিকাতা

প্রিয়বরেষু,

সে-দিন আপনাদের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় দুঃখিত হয়েছি। কিন্তু কবিতা পেয়েছি এবং পড়েছি ; ধন্যবাদ। আরও বার কয়েক পড়ে আমার মতামত জানাবো—ইতিমধ্যে এটুকু মানতে পারি যে ভালো লেগেছে, যদিও সমস্তটার অর্থ ও সঙ্গতি বুঝতে পেরেছি, তা বলা চলে না।

রবিবার চায়ের নিমন্ত্রণের জন্যে কৃতজ্ঞতা জানবেন। সাড়ে চারটে আন্দাজ আসবো আমরা ; কিন্তু ছটার মধ্যে ফিরতে হবে। ইতি ৫ ডিসেম্বর

ভবদীয়
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৮ই×৫ই সাদা দামী অ্যান্টিক কাগজে লেখা। তারিখ নেই। মনে নয় ১৯৫৯-এ লেখা, কারণ ঐ বছরের ডিসেম্বরেই রাজেশ্বরী দত্ত নাকি প্রথম বিষ্ণু দে-র "বাড়িতে চা খেতে আসেন"।

৫১

৬নং সুইট
৬ রাসেল স্ট্রীট
কলিকাতা ১৬

প্রিয়বরেষু,

রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে লেখা কিসের উপলক্ষে, কোন্ প্রতিষ্ঠানের জন্যে চাই, তা কিছুতে মনে করতে পারছি না। কিন্তু সে-সব কথা স্মরণে থাকলেও, এই বিষয়ে আরও প্রবন্ধ আমার কলম দিয়ে বেরোবে বলে বোধ হয় না। বর্তমান প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য "কুলায় ও কালপুরুষের" একশ পাতা আন্দাজ জুড়ে আছে; এবং যতটুকু উদ্বৃত্ত ছিল, তা কুড়িয়ে ভারত সরকারের শতবার্ষিকী গ্রন্থের জন্যে পাঁচ হাজার শব্দের এক ইংরেজী রচনা এই মাত্র শেষ করেছি। আরও বলার কথা পাব কোথায়? অতএব যদি দুর্বল মুহূর্তে প্রতিশ্রুতি দিয়েও থাকি, তবু আমাকে মাপ করবেন।

এ-বারকার গ্রীষ্মের তুলনা নেই; এবং আষাঢ়ের প্রথম দু দিন যখন বিনা বৃষ্টিতে কাটল, তখন এ-বছরে বর্ষা না আসাই সম্ভব। এ-অবস্থায় কেমন আছেন জানতে চাওয়া অনাবশ্যক। তাহলেও আশা করি খুব খারাপ নেই আপনারা সকলে। যদি কোনও দিন উত্তরপাড়া আসেন, তবে আসবেন আমাদের এখানে। অনেক কাল দেখা হয়নি। ইতি ১৬ জুন ১৯৬০

ভবদীয়
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৭ই × ৫·৩ই নীলাভ কাগজ। বিষ্ণু দে-কে লেখা সুধীন্দ্রনাথের শেষ চিঠি। ৯দিন পরে সুধীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। বোধহয় 'সাহিত্যপত্রে'র রবীন্দ্রসংখ্যার জন্যই তাঁর প্রবন্ধ চাওয়া হয়। 'কুলায় ও কালপুরুষে'র একশ পাতা—ঐ গ্রন্থের প্রথম ৫টি প্রবন্ধই রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক (পৃ ১-৭৪)। ইংরেজি রচনা—হুমায়ুন কবীরের অনুরোধে সাহিত্য অকাদেমির Centenary Volume-এর জন্য লেখেন—কিছু 'আপত্তিকর' মতামতের জন্য সেখানে ছাপা হয় নি—পরে আইয়ুব-সম্পাদিত

'কোয়েস্টে' ছাপা হয়: Tagore as a Lyric Poet। প্রবন্ধটি সুধীন্দ্রনাথের ইংরেজি রচনার সংকলন 'The World of Twilight/Essays and Poemes by/Sudhindranath Datta' (OUP, 1970) গ্রন্থে সংকলিত। ব্লকে ছোট করে ছাপা হয়েছে বলে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে "আষাঢের" শব্দটি ভালোভাবে ওঠে নি—কাটাকুটি থাকলেও সুধীন্দ্রনাথ সঠিকভাবে 'ঢ'-ই ব্যবহার করেছেন।

চিঠি প্রসঙ্গে

সর্ব বিষয়েই সুধীন্দ্রনাথের শৌখিনতা তো বিখ্যাত—চিঠি লেখার ব্যাপারেও তিনি বেশ শৌখিন ছিলেন। খুব দামী কাগজে লিখতেন—নানা বর্ণের কাগজ (কখনো সাদা, কখনো হাল্কা ছাই বা নীল, কখনো-বা সবুজাভ)। প্রথম দিকের বেশির ভাগ চিঠিতেই সাবেকি বাংলা লিপির ছাঁদে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের ঠিকানা লাল রঙে উঁচু করে খোদাই বা ইম্‌বস (emboss) করা থাকত—কোনো চিঠিতে সেটাই ইংরেজিতে। 'পরিচয়'-নামাঙ্কিত কাগজে ও পোস্টকার্ডেও ছোট চিঠি লেখা হত। পরের দিকে চারু-বিশ্বলের নামাঙ্কিত প্যাডের কাগজে। বলা বাহুল্য মুদ্রণচিহ্নবিহীন দামী কাগজেও লিখতেন। সবচেয়ে শৌখিন এবং পছন্দের ছিল বোধহয় চার-ভাঁজ-করা প্রায়-চৌকো, একদা যে ধরনের মোটা অ্যান্টিক কাগজ এদেশে পাওয়া যেত, খুব আদৃতও হত, সেই কাগজে লেখা চিঠিগুলো। অনেক সময় মাঝের পৃষ্ঠা দুটি বাদ দিয়ে প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠায় লেখা। হাতের লেখা খুব বড়, স্পষ্ট ও সুন্দর। প্রায় সব চিঠিই বেশ যত্ন করে লেখা। একটি চিঠিই মাত্র (১০ নং) পেন্সিলে বাস্তভাবে লেখা। বহু চিঠিই মনে হয় দোয়াত-কলমে লেখা—প্রধানত কালো কালিতে, কয়েকটি খুব পাতলা জলো কালিতে, এবং কয়েকটি বেগনি কালিতে।

বুদ্ধদেব বসু 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ'-এর ভূমিকায় লিখেছেন, ১৯২২ সালের খাতায় সুধীন্দ্রনাথের "হস্তলিপিও কাঁচা, এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, অক্ষরগুলি কোণবহুল ও বিশ্লিষ্ট, তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব একেবারেই নেই।"[১] ১৯২৮ সালের বা তার পরবর্তীকালের চিঠিতেও মনে হয় তাঁর হাতের লেখায় পুরোনো বাংলা লেখার আদল রয়েছে—কিন্তু অকস্মাৎ যেন ৫নং চিঠি থেকেই তাঁর হাতের লেখা খানিকটা সচেতনভাবেই রাবীন্দ্রিক হতে থাকে।

বেশ কিছুকাল পর্যন্ত সুধীন্দ্রনাথ হঠাৎ হঠাৎ ভুল বানান লিখতেন এবং সব কটিই কলম-পিছল ভুল এমন মনে করা অসম্ভব। বুদ্ধদেব বসু-র ভাষায় "যিনি উত্তরজীবনে বাংলা ও বাংলায় ব্যবহারযোগ্য প্রতিটি সংস্কৃত শব্দের

নির্ভুল বানান জানতেন"[২] এবং যাঁকে "বানান ও ব্যাকরণ বিষয়ে···আমরা অভিধানের মতো ব্যবহার করেছি"[৩]—সেই সুধীন্দ্রনাথের পরিচয় কিন্তু এ-সময়ে মাঝে মাঝেই ব্যাহত।

সুধীন্দ্রনাথের সৌজন্যবোধ ও বিনয়ের কথা অনেকেই বলেছেন, অনেকে তার মধ্যে "তাঁর রক্ষণশীল হিন্দু বাঙালি পরিবারের" ঐতিহ্যও দেখেছেন—সেই আভিজাত্যমণ্ডিত নম্রতা ও ভব্যতার পরিচয় তাঁর চিঠিতে সর্বত্র—চিঠির ভাষায়, সম্বোধনে, উপসংহারে। কখনো কখনো এই সৌজন্যের একটু বাড়াবাড়িও বোধহয় ঘটে—যখন দেখি সাতাশ বছরের যুবক উনিশ বছরের তরুণের কাছে আত্মপরিচয় দেন "বশংবদ" বলে।

সুধীন্দ্রনাথ এমনকি ঠিকানাটাও লিখতেন খুব যত্ন করে এবং বন্ধুর নামের পাশে Esq কখনো বাদ দেন নি। প্রথম দিককার ৭টি চিঠিতে খামে বা পোস্টকার্ডে বিষ্ণু দে-র ঠিকানা লেখা আছে : ১০৯, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা। ১৯২২ সালেই খানিকটা স্থানাভাবের কারণে এবং খানিকটা ডাক্তারী কারণে কলেজ স্কোয়ারের বাড়ি (সংস্কৃত কলেজের উল্টো দিকে শ্যামাচরণ-বিমলাচরণ দে বিশ্বাসের যৌথ পরিবারের বাড়ি) ছেড়ে বিষ্ণু দে-র পিতা উঠে আসেন সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটের বাড়িতে। ১৯৩৫-এর জানুয়ারি থেকে পি ৫৫১ ডি, রাসবিহারী এভিনিউ-র ভাড়া বাড়ির ঠিকানা। তাই ৮নং চিঠি থেকে ঐ ঠিকানাতেই চিঠি। (মাঝখানে দু-মাস রসা রোডে ছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে লেখা সুধীন্দ্রনাথের কোনো চিঠি নেই)। ১৯৩৯-এর জানুয়ারিতে উঠে আসেন ১৯এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডের ভাড়াবাড়িতে, প্রায় একবছর থাকার পর ঐ রাস্তার ১/১০ নং বাড়িতে। ১৯এ-র কোনো চিঠি নেই, কিন্তু ১৮ নং চিঠি থেকে বাকি প্রায় সব কটিই বর্তমান ঠিকানা ১/১০-এর উদ্দেশ্যে লেখা। বলা বাহুল্য, যখন তিনি বেড়াতে গেছেন পুরী বা মধুপুর বা রিখিয়ায়, তখন সেখানকার ঠিকানায়।

চিঠির ওপরে সুধীন্দ্রনাথের ঠিকানাও বিচিত্র। হাতিবাগানের পৈতৃক বাড়ি ১৩৯ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের ঠিকানা স্বভাবতই প্রথম দিককার চিঠিতে। ঐ বাড়িতেই ছিল 'পরিচয়'-এর আড্ডা। ৩নং চিঠি থেকে পর পর কয়েকটি স্টিফেন হাউসের ঠিকানা—যদিও 'পরিচয়'-এর কার্ড—বোধহয় 'লাইট অব

এশিয়া ইন্‌শিওরেন্স কোম্পানি'-র তৎকালীন চাকুরে হিসেবে তাঁর অফিসের ঠিকানা ছিল ওটাই। ১৯৪১ থেকে হঠাৎ হাজরা রোডের ঠিকানা—সুধীন্দ্রনাথ তখন মামার বাড়ির সূত্রে পাওয়া ঐ বাড়িতে সস্ত্রীক থাকতেন। বিষ্ণু দে লিখেছেন, "তারপরে সুধীন্দ্র হাজরা রোডে উঠে যান। শনিবার রবিবার তাঁর পিতা হাতিবাগান থেকে ঐ বাড়িতে কাটাতেন। ঐ বাড়িতেই একদা বসুমল্লিকদের আরেক জামাতা চারুচন্দ্র দত্তও ছিলেন।" ঐ বাড়িতে থাকার সময়ই নাকি সুধীন্দ্রনাথের জীবনের নানা পরিবর্তন—কিছুটা উন্মার্গ জীবনযাপন, পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে মতবিরোধ,প্রথমাস্ত্রীত্যাগ ইত্যাদি ঘটনা ঘটে। বিষ্ণু দে-র সঙ্গেও ঘটে তাঁর "মনান্তর" বা "মতান্তর"। ফলে ঐ ঠিকানার চিঠি মাত্র একটি। তারপর ১৯৪৭ থেকে মৃত্যুর পূর্বের শেষ চিঠি পর্যন্ত রাসেল স্ট্রিটের ঠিকানা, সাহেবী পাড়ার যে ফ্ল্যাটে সুধীন্দ্রনাথ কিছুটা আধুনিক আভিজাত্যে জীবনযাপন করতেন দ্বিতীয়া স্ত্রী রাজেশ্বরীর সঙ্গে।

বিষ্ণু দে-র মূল চিঠিটি আমাদের খুবই দেখতে ইচ্ছে হয়, জানতে ইচ্ছে হয়, কেন সুধীন্দ্রনাথ তাঁর "লেখার কায়দা", "কথার ইঙ্গিত" বা "অস্পষ্ট পরিচয়ের যাদু"-র কথা বলেছেন এত উচ্ছ্বসিতভাবে। কিন্তু চিঠির কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। বোধহয় চিঠি রাখার অভ্যাস সুধীন্দ্রনাথের ছিল না। 'সুধীন্দ্রনাথ-এম. এন. রায় পত্রাবলী' সম্পাদনা করতে গিয়েও সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ-রাজেশ্বরী দত্তের বাড়িতে কোনও চিঠি পান নি লিখেছেন।... সুধীন্দ্রনাথ দেখা যাচ্ছে আগের সাক্ষাতের কথা ভুলে গেছেন—কিন্তু কনিষ্ঠ বিষ্ণু দে-র কাছে সুধীন্দ্রনাথ তো তখন প্রায় 'হিরো'—তাঁর মনে অগ্রজ সম্পর্কে অনেক "জিজ্ঞাসা"।

২

প্রথম প্রবন্ধে সে-যুগের কলকাতা সম্পর্কে দু-চার কথা উঠেছিল। বস্তুত সেই কলকাতা খুবই 'ছোট'—আজকের তুলনায়—শান্ত এবং ঘরোয়া। কলকাতা, অর্থাৎ এখনকার উত্তর কলকাতা তখন কতকগুলি গোষ্ঠীতে বা পাড়ায় যেনবিভক্ত ছিল—আজকের সমাজবিজ্ঞানীর ভাষায় বর্ণভিত্তিক কয়েকটি

'দলে'। এই দলের মধ্যে সংহতি ও সংযোগ যেমন ছিল, তেমনি ছিল প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, কানভাঙাভাঙি। এটা, বলা বাহুল্য, উনিশ শতকের কলকাতারই উত্তরাধিকার। তাই অবাক লাগে না যে এই ছোট কিন্তু সংহত ও উৎসুক ও প্রাণবন্ত কলকাতায় 'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা কিভাবে দুটি ঘনিষ্ঠ পরিবারের আলোচনার—এমনকি ঈর্ষার ও গুজবের—বিষয় হতে পারে। এবং সেই সূত্রে আবার সম্পাদক শুধু বিচলিতই নন, সম্পাদকীয় নীতি সম্পর্কে গম্ভীর বিচারেও রত হতে পারেন।

২নং চিঠিটির ভুল বোঝাবুঝির পেছনে এই কলকাতারই ইতিহাস। উত্তর কলকাতার কয়েকটি কায়স্থ পরিবারের বৈবাহিক সম্বন্ধের সূত্রে তৈরি ছোট্ট জগৎ।

"সুবোধ বসুমল্লিক—সুধীনবাবুর মামা। সুবোধ বসুমল্লিকের ছোট মেয়ের (প্রথম পক্ষের) সঙ্গে বিয়ে হয় সুকুমার দে-র (ওঁর [বিষ্ণু দে-র] জ্যাঠতুতো দাদা শ্যামাচরণ দে বিশ্বাস মহাশয়ের তৃতীয় ছেলে নরেশচন্দ্র দে-র বড় ছেলে) ···। বসুমল্লিকদের বাড়িও ছিলো পটলডাঙা পাড়ায়—শ্রীগোপাল বসুমল্লিক লেন এখনও আছে। পরে, বসুমল্লিকরা উঠে যান ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। আর ৩নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ওঁর ছোট মামার···বাড়ি। কাজেই বসুমল্লিকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা। সুধীনবাবু কলেজ স্কোয়ারের বাড়িতে ওঁর মামার (নীরদ বসুমল্লিকের) সঙ্গে আসতেন, খুব সেজেগুজে, দারুণ handsome ছেলে—মাঝে মাঝে সাহেব সেজে, মাঝে মাঝে লাল সিল্কের পাঞ্জাবি ও সাদা ধুতি পরে। তখন বাড়িতেই আলাপ হয়। ১৯২১-২২ এরকম সময়ে।··· তারপর, ওঁর মামাতো বোন (আমার শাশুড়ি-মায়ের খুড়তুতো ভাই গর্ডনমামার মেয়ে) ছবিদির সঙ্গে সুধীনবাবুর বিয়ে হয়, বোধহয় ১৯২৪-২৫ এ। তখনও আবার আলাপ হয়।···" (প্রণতি দে-র চিঠি)। কলকাতার কায়স্থসমাজের এই জটিল সম্পর্কবিন্যাসে অনভ্যস্ত শ্রোতা কিঞ্চিৎ দিশেহারা হতে পারেন এই বর্ণনায়, কিন্তু বিষ্ণু দে-র আলাপচারণেও থাকে এই অভ্যস্ত ও অনায়াস বিচরণ।

১৯৩০ সালে যে দুটি কবিতা হাতে নিয়ে নীরেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে এসে ছিলেন বিষ্ণু দে সুধীন্দ্রনাথ সকাশে, সে দুটিই প্রকাশিত হয় 'পরিচয়'-এর ১ম সংখ্যায়। কবিতা দুটি নিয়ে সুধীন্দ্রনাথের মামার বাড়িতে—পটলডাঙার

বসুমল্লিকদের বাড়িতে—কথা হয়ে থাকবে। হয়তো কেউ কেউ বিরূপ সমালোচনাও করেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে সেই আলোচনায় অংশগ্রহণও খুব স্বাভাবিক, কারণ মামাবাড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল গভীর। সুধীন্দ্রনাথের ভাই হরীন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, "…আমাদের মামা সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক মহাশয়ের প্রভাব আমাদের ওপর পড়তে থাকে। তাঁদের বাড়িতে দাদা [সুধীন্দ্রনাথ] প্রায়ই যেতেন এবং বলতে গেলে মামাবাড়ির পরিবেশ আমাদের জীবনে খুবই ফলপ্রদ হয়েছিল।"[৪] মামাতো ভাই প্রবীরচন্দ্র বসুমল্লিক লিখেছেন, "তাঁদের [সুধীন্দ্রনাথদের] বাড়ির ধারা ছিল প্রাচীনপন্থা, কিন্তু মাতুলালয়ের আভিজাত্যের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য আধুনিকতার সমন্বয় ঘটেছিল। সেইজন্য সুধীন্দ্রনাথ তাঁর মাতুলালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন।"[৫]

বিষ্ণু দে-ও আত্মীয়তার সুযোগে কথাচালাচালির সূত্রে শুনতে পান, সুধীন্দ্রনাথ নাকি বলেছেন ঐ মামাবাড়ির আড্ডায় যে তিনি বিষ্ণু দে-র কবিতা দুটি "উপরোধে পড়ে" ছেপেছেন। বিষ্ণু দে-কে চিঠি লিখে এখন এ-সম্পর্কে যেটুকু স্মৃতিমণ্ডিত জবাব পাই, তা এই: "এক পারস্পরিক আত্মীয়কুটুম্ব আমাদের চেনা আড্ডায় যুবক-কিশোরদের আলোচনা হত। তাতে নাকি শোনা গিয়েছিল সুধীন্দ্রনাথের ঐ রকম কথা এবং কথাটা আমার আত্মীয়মুখেও শুনি। আমার এক নিকটআত্মীয়, সম্পর্কে স্নেহভাজন ভাই—[বিষ্ণু দে-র] 'মাতুলালয়' সুধীন্দ্রনাথের মাতুলালয়ের খুব কাছে ও ঘনিষ্ঠ।" আজন্ম সৌজন্যবোধের পরাকাষ্ঠা ও নবীনবন্ধুর গুণমুগ্ধ সুধীন্দ্রনাথ কিরকম বিচলিত হয়েছেন, তাও দেখা যাচ্ছে এই চিঠিতে।

সুধীন্দ্রনাথ—যাঁর সৌজন্যপ্রকাশ নির্ভুল অথচ মজা পেলে যাঁর "ভ্রূযুগল জ্যাটানা ধনুকের মতো কপালে ওঠে"[৬]—তিনি কি তর্কের সময়ে একটু রূঢ় বা দুর্মুখ হয়ে উঠতেন? কেউ কেউ প্রায় এরকমই অভিযোগ করেছেন, হয়তো একটু মোলায়েম ভাষায়—যেমন হিরণকুমার সান্যাল লেখেন, "সুধীনের যখন তর্কের নেশা পেত, তখন তার সামনে দাঁড়ায় কে?…সুধীনের মতো বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বিদগ্ধ ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিরল কিন্তু ওই রকম মর্মঘাতী ব্যঙ্গ আমি খুব কম লোকের মুখে শুনেছি।…সুধীন দত্তের গালিগালাজের মধ্যেও এমন একটা কেতা থাকত যে মনে হত তা যেন অভিনয়দুরস্ত"[৭]

বিষ্ণু দে অবশ্য একটু ভিন্ন মত পোষণ করেন। সুধীন্দ্রনাথ চিঠিতে (২ নং) যে "অন্যায় তর্ক করা" বা কথার মধ্যে "অত্যধিক ঝাঁজ" প্রকাশের জন্ম ক্ষমা চেয়েছেন—তা কি তাঁর স্বভাবসৌজন্যের বিরোধী নয়? বিষ্ণু দে চিঠিতে জবাব দেন : "'অত্যধিক ঝাঁজ'? না বোধহয়। তর্ক করতে ভালোবাসতেন অনেকের সঙ্গেই—এক বোধহয় সত্যেন বসু ছাড়া।" শেষের অংশটির আরেকটু ব্যাখ্যা আছে তাঁর প্রবন্ধে : "সেই জন্যে দেখতুম সৌজন্যে শিক্ষিত, কিন্তু নিজ বুদ্ধিবিদ্যায় অনতিবিনীত সুধীন্দ্রের বন্ধুত্বের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের নানা বিষয়ে জ্ঞানে ও বোধিতে বিনীত নির্ভরশীলতা।"[৮]

৫

সুধীন্দ্রনাথ যে বিষ্ণু দে-কে "লেখাটি" নিয়ে আসতে বলেছেন বৈঠকে, তা কি পাঠের জন্য? সাধারণত 'পরিচয়'-এর বৈঠকে লেখা পড়া হত না, নিছক আড্ডাই হত—তবে কা লেখা যাবে তা নিয়ে পরিকল্পনা বা কথাবার্তা হত, সুধীন্দ্রনাথ বিভিন্ন জনকে লেখার ভার দিতেন এবং লেখা জমাও পড়ত ঐ বৈঠকেই (শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের লেখায় তার চমৎকার বিবরণী আছে)। তাই বিষ্ণু দে জানিয়েছেন, "হাক্সলি-রিভিউ ছাপাবার জন্যে। পড়বার জন্যে নয়।" বিষ্ণু দে-কে যে সুধীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই পুস্তক সমালোচনার জন্য তাগাদা দিতেন (এই চিঠিতে তো বটেই, অন্য চিঠিতেও) —সেই বইগুলোর নাম কি তাঁদের পূর্বের কথালাপের সূত্রেই আসত? না কি সুধীন্দ্রনাথেরই ভাবনা থেকে? বিষ্ণু দে সংক্ষেপে লেখেন : "নিশ্চয়ই কথাবার্তার মধ্যে দিয়েই পুস্তকসমালোচনার কথা উঠত।"

৬

কবিতা রচনায় গোড়ার দিকে বিষ্ণু দে-র একটা প্রধান অবলম্বন ছিল এই 'ট্রিওলেট'। রোমান্টিকতাবিরোধী বা প্রেরণাবেগবিরোধী প্রতিক্রিয়ায় বিষ্ণু দে যে বহিরঙ্গ রূপসাধনা বা টেকনিকের চর্চা করতে চেয়েছিলেন কবিতায়, প্রস্তুতির এই পর্বে, তার চমৎকার বাহন ছিল এই ট্রিওলেট। বিষ্ণু দে এর অনুবাদ হিসেবে 'তেপাটি' নামটিও গ্রহণ করেন প্রমথ চৌধুরীর কাছ থেকে। রাবীন্দ্রিক ব্যর্থ অনুকরণের যুগে যখন ভাবোচ্ছ্বাসের কবিয়ানা ঢঙ প্রবল হয়েছিল তখন ট্রিওলেট, প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়, "লেখনীর

কসরত"-ই ছিল প্রতিবাদের ভাষা। প্রথম চৌধুরীর কাছে যেমন, তেমনি পরবর্তী যুগে বিষ্ণু দে-র কাছেও। "কৃত্রিম" এবং "কবিতার formalness" সন্দেহ নেই—কিন্তু পরবর্তীকালে "জীবনের সত্যতা"-তে পৌঁছনোর জন্য এটা ছিল তাঁর কাছে একটা সিঁড়ি।

এর পর 'উর্বশী ও আর্টেমিস' বেরোয় ১৯৩২-এ। সুধীন্দ্রনাথের কতখানি "মানসিক বাধা" ছিল আগে জানি না, কিন্তু প্রকাশের পর তিনিও নাকি "খুশি" হন। "অনেক কবিতা আগে ছিঁড়ে ফেলার পর" পিতার অর্থানুকূল্যেই বইটি ছাপা হয়—এবং প্রথম থেকেই বইটির বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, জীবনময় রায়, প্রশান্ত মহলানবীশ—তা ছাড়া সুধীন্দ্রনাথ তো বটেই।

প্রথম দিকে 'পরিচয়'-মণ্ডলীর বাইরের বহু জনেরই লেখা পাঠানো বা ছাপানোর যোগসূত্র ছিলেন বিষ্ণু দে—হেমচন্দ্র বাগচীর তো বটেই। বিষ্ণু দে তাই লিখেছিলেন, "হেম বাগচীর কবিতা, বুদ্ধদেব বসুর কবিতা, বোধহয় অচিন্ত্যবাবুর [সেনগুপ্ত] কবিতা পরিচয়-এ আমার মাধ্যমে" প্রথম ছাপা হয়।

তবে প্রথমাবধি 'পরিচয়'-এর একজন বড় সহায়ক ছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়: 'পরিচয়'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সুধীন্দ্রনাথের ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু-র অন্তরঙ্গ, আবার বিষ্ণু দে-র স্বল্পকালের গৃহশিক্ষক। বিষ্ণু দে-র প্রথম দিককার কবিতার একজন উৎসাহী পাঠক ছিলেন তিনি—'উর্বশী ও আর্টেমিস' ওঁকেই উৎসর্গ করেন কবি। কিন্তু পরে সে উৎসাহে বোধহয় ভাঁটা পড়ে।

৭

কবীরের সঙ্গে 'পরিচয়'-এর সম্পর্ক কতদূর ছিল? শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ লিখেছেন, "কবীর এক শুক্রবার আসর ডাকেন তাঁর বাড়িতে।·· কবীর 'পরিচয়' পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন ১৩৪১ সালের মাঘ সংখ্যা থেকে। বোধ করি অক্সফোর্ড থেকে অল্প দিন হলো ফিরেছিলেন।...সুধীন্দ্রর আসরে সহজেই নিজের বিশেষ স্থান করে নেন।"[৯] আর বিষ্ণু দে লেখেন, "কবীরের বাড়িতে মাঝে মাঝে গেছি। তাঁর সহপাঠী আমাদের পরমবন্ধু হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে।"

এ-সময়ের অসুস্থতা প্রসঙ্গে প্রশ্নের জবাবে বিষ্ণু দে লেখেন, "হঠাৎ গলায় সংক্রাম হয়। সন্ধ্যাবেলায় পটলডাঙ্গার পটুয়াটোলায় গিয়ে ফেরার সময়ে গলা ব্যথা টের পেলুম। বেশ ভোগালো। হৃদ্চাঞ্চল্য ও সংক্রামও। তারপর থেকে পিত্তশূলও। ইত্যাদি।" এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই অসুস্থতার সময়ই (৪ বা ৫ জানুয়ারি) বিষ্ণু দে জ্বরের ঘোরে দুই দফায় বিখ্যাত 'ঘোড়সওয়ার' কবিতা লেখেন (প্রণতি দে-র জবানি অনুসারে)।

১১

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন 'পরিচয়'-এর আড্ডার একজন উৎসাহী যদিচ (লখনৌতে বাস করার কারণে) অনিয়মিত সদস্য। "Intellectual class তৈরি"-তে "পরিচয়ের আড্ডা"-র অবদান বিষয়ে অত্যুৎসাহী। বোধহয় সেই সূত্রে একটু অহংকারও প্রশ্রয় পায়—যখন বলেন, "সুধীন্দ্রের স্টাণ্ডার্ডই ছিল সবচেয়ে উঁচু, আমাদের কারুরই নিচু ছিল না।"[১০] ধূর্জটিপ্রসাদের জীবনীকার লিখেছেন, "সাহিত্যে এবং বিশেষত রাজনীতির ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদের সর্বদা মতৈক্য ছিল না, তবু পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বগত' ধূর্জটিপ্রসাদকে উৎসর্গ করেছেন, ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর 'আবর্ত' উপন্যাস সুধীন্দ্রনাথকে। উভয়ের আজীবন প্রগাঢ় বন্ধুত্বের পরিচয় আছে তাঁদের চিঠিপত্রে এবং ধূর্জটিপ্রসাদের বহু রচনায়।"[১১] বিষ্ণু দে-ও বলেছেন ধূর্জটিপ্রসাদকে "আমার-স্কুলপালানো-দিন থেকে চেনা অগ্রজ কিন্তু সময়জয়ী বন্ধু।"[১২]

এই চিঠিতে তো বটেই, বহু চিঠিতেই সুধীন্দ্রনাথ কি পড়লেন বা পড়ছেন তার খবর জানান বন্ধুকে। বইয়ের নাম থেকে জানতে ইচ্ছে হয় ওঁর এই সময়ের পাঠের ধরনটা। বিষ্ণু দে লেখেন, "সুধীন্দ্রনাথ ফরাসী বই ও পত্রিকা কিনতেন ও পড়তেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রভাব নিশ্চয়ই প্রবল ছিল।" তা ছাড়া প্রবোধচন্দ্র বাগচী তো ছিলেনই কাছাকাছি। তাই কি উল্লিখিত তিনটি গ্রন্থের দুটিই ফরাসী ভাষায়?

১২

"কবিতা ত্রৈমাসিক" প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে লেখেন, "বোধহয় বৌদ্ধ 'কবিতা'-ই।

বুদ্ধদেব, সমর, এঁরা সবাই উৎসাহী ছিলেন। ২৫্ টাকা তোলা হয় প্রথম সংখ্যায়।" উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম দিকে 'পরিচয়ে'র জন্য বুদ্ধদেব বসু-র কবিতা এবং 'কবিতা'র জন্য সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র কবিতা উভয়েরই সংগ্রাহক ছিলেন বিষ্ণু দে।

• কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'পূর্বাশা'-র ১ম সংখ্যারই লেখক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ এবং দু-এক সংখ্যা বাদে বিষ্ণু দে-ও। প্রথম থেকেই 'পূর্বাশা' লাভ করে "কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির পূর্ণ সহযোগিতা এবং আভিজাত পরিচয়-এর সমর্থন।"[১৩] ফলে সুধীন্দ্রনাথের পক্ষে 'অর্কেস্ট্রা'-র সমালোচনা পূর্বাশা'-য় ছাপতে চাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

১৩

'অর্কেস্ট্রা'-র "রিভিউ"টি পাওয়া যায় না বলে এই চিঠিতে এবং পরের চিঠিতে সুধীন্দ্রনাথের দু-একটি মন্তব্যকে ভিত্তি করেই মূল লেখাটির একটা হদিশ পাবার চেষ্টা করেছি আমরা। বিষ্ণু দে-কে চিঠি লিখে যে উত্তর পাই, তা এই : "সুধীন্দ্রনাথের অর্কেস্ট্রা রিভিউ সঠিক মনে নেই। গণেশচন্দ্র এভিনিউ-তে বোধহয় তখনও 'পূর্বাশা' বেরোত। 'চতুরঙ্গ' পাড়ায়।…ক্লাসিক মেজাজের প্রয়াস ছিল, কিন্তু প্রয়াস বোধহয়—মিলটন বা রাসীন্—এমনকি আমাদের রোমান্টিকক্লাসিসিস্ট মাইকেলের সঙ্গেও সম্পূর্ণ তুলনীয় নয়। 'ক্রন্দসী' ও শেষের দিকের ছোট কবিতাগুলি বরং আরো সার্থক ও সুগঠিত। তাই কি বলবে?"

এর আগেই আমাদের বন্ধু কেতকী কুশারী ডাইসনের সঙ্গে এই তুলনার ভিত্তি নিয়ে একদিন আলোচনা হয়। অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি এই ছোট্ট টিপ্পনীটুকু চিঠিতে লেখেন :

"মিলটন এবং রাসিন দু'জনকেই ইয়োরোপের 'নব্যক্রপদী' (neo-classical) রীতির নিপুণ শিল্পী বলা চলে। রোম্যান্টিক পরিপ্রেক্ষিতে এঁদের শিল্প বাগাড়ম্বরভিত্তিক, কৃত্রিমতা-ঘেঁষা ইত্যাদি ঠেকতে পারে, কিন্তু তার সংগীতের সঙ্গে একবার অনুরণিত হতে পারলে তাকে প্রথম শ্রেণীর শিল্প ব'লে চিনে নিতে কোনো অসুবিধা হয় না। বিষ্ণুবাবু যদি সুধীন্দ্রনাথকে মিলটন ও রাসিনের সবর্ণ শিল্পী ব'লে থাকেন, তা'হলে সে তুলনাটা, আমার ব্যক্তিগত মতে, সুচিন্তিত এবং বৈধ।

অপরপক্ষে, সুধীন্দ্রনাথের তুলনাটি ভিন্ন জাতের। তিনি নিজেকে মালার্মের শিষ্য হিসেবে দেখতে ভালবাসতেন। এটা তাঁর একটা প্রিয় self-image, যা তিনি তুলে ধরতে আগ্রহী ছিলেন, এবং যার যাথার্থ্য প্রসঙ্গে প্রচুর তর্কের অবকাশ আছে। আর নিজেকে বেডোজের অনুকারক বলার মধ্যে নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা আছে। টমাস লাভেল বেডোজ (১৮০৩-১৮৪৯) একজন উনিশ শতকী 'গৌণ' ইংরেজ কবি, যিনি এলিজাবেথীয় রীতির অনুকরণে নাটক লিখতেন, যাঁর রচনায় এলিজাবেথীয় কায়দায় মৃত্যুর চিত্রকল্প বিশেষ লক্ষণীয়, এবং যিনি আত্মহত্যা করেন। সপ্তদশ শতকে রচিত হ'লে এঁর নাট্যকলা প্রথম শ্রেণীর শিল্প ব'লে পরিচিত হোতো, কিন্তু উনিশ শতকে রচিত হওয়ায় সাহিত্যিক অকালকুসুম—anachronism—হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। লিটন্ স্ট্র্যাচি এঁকে 'the last Elizabethan' বলেছেন। নিজেকে বেডোজের অনুকারক বললে নিজেকে অনুকারকের অনুকারক, বোহেমিয়ান, বাউণ্ডুলে, নিঃসঙ্গ, অকালজাত ইত্যাদি বলা হয়। সুধীন্দ্রনাথের এই তুলনাটার মধ্যে অভিমান আর আত্মবিদ্রূপে মেশানো একটা self-image ফুটে উঠেছে।"

হয়তো বেডোজের সঙ্গে তুলনাটি সম্পূর্ণ আত্মবিদ্রূপ ও অভিমান কিনা তা নিয়ে একটু প্রশ্ন আসে, কিন্তু মালার্মে সম্পর্কে কেতকী যা বলেছেন, তা ঠিকই। মালার্মের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের যেটুকু মিল, তা হল প্রেরণা-বিরোধী, পরিশ্রম-সাধ্য স্বায়ত্তশাসনের প্রতিজ্ঞায়—নচেৎ কাব্য-অভিজ্ঞতায় উভয়ের ব্যবধান দুস্তর।

১৪

বিভূতিভূষণের 'দৃষ্টিপ্রদীপ'-এর সমালোচনা কি বিষ্ণু দে-র করার কথা হয়েছিল (দ্র, ১৩ নং চিঠি)? সমালোচনাটির গুণাগুণ সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের অনুভূতি দেখা যাচ্ছে মিশ্র। কিন্তু সত্যিই কি "বইখানার বিরুদ্ধে লেখকের বিশেষ কোনো নালিশ নেই"? জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-র ঐ রিভিউটির শেষাংশে আছে: "অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এটা অস্বীকার করা যায় না যে এই বইটা লেখকের অন্যান্য বইয়ের চেয়ে কিছু বেগবান হয়েছে। কিন্তু মননশীলতার চর্চা না করলে এর চেয়েও উন্নত ধরণের কিছু লেখা সম্ভব হয়ে উঠবে না।...এবার তাঁর cerebral cortex-এর দিকে নজর দেবার সময় হয়েছে।"[১৪]

১৬

প্রথম অনুচ্ছেদে বিষ্ণু দে-র "অস্বাস্থ্য" এবং "আরোগ্যে"র দীর্ঘ প্রসঙ্গ। ১৯৩৫-৩৬ সাল নাগাদ শরীর যখন তাঁর খুব দুর্বল ছিল, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষই তাঁকে মধুপুর যেতে পরামর্শ দেন। ইংরেজির শিক্ষক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র ছিলেন বিষ্ণু দে এবং তাঁর উপর ঐ শিক্ষকের প্রভাব ছিল গভীর। রবীন্দ্রনারায়ণ ওঁর জন্য একটা বাড়িও ঠিক করে দেন মধুপুরে, ১৯৩৬-এ এক মাস সেই বাবদ ছিলেন তাঁরা মধুপুরে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে 'পরিচয়'-এর "বন্ধুবান্ধব"দের একটা চিত্তাকর্ষক সংবাদবিবরণ আছে। এর মধ্যে শাহেদ সুরাবর্দি "নানাভাষাবিদ শিল্পরসিক"—বিখ্যাত শহীদ সুরাবর্দির ভাই—সুধীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে 'পরিচয়'-এর বন্ধু—যদিও বাংলা জানতেন না। বিষ্ণু দে-কে অবশ্য তাঁর শিল্পবিষয়ক মতামতের তীব্র প্রতিবাদ করতে হয়েছিল 'সুরুচি ও পণ্ডিতম্মন্যতা' প্রবন্ধে। অপূর্বকুমার চন্দ বিশিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ—আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের কারণেও বিখ্যাত। আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গেও বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব ছিল গভীর এই যুগে—বিষ্ণু দে 'চোরাবালি' গ্রন্থের 'ওফেলিয়া' কবিতাটি এঁকেই উৎসর্গ করেন এবং সুধীন্দ্রনাথ তাঁর 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থটি। পরে অবশ্য রাজনৈতিক এবং হয়তো নান্দনিক কারণেও সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই বন্ধুত্বের যতটা প্রসার ঘটে, বিষ্ণু দে-র সঙ্গে তা ক্রমশই সঙ্কুচিত হতে থাকে।

১৭

"পুরী থেকে স্বাস্থ্যসঞ্চয় করে" ফেরার কথা এখানেও আছে। ১৯৩৬ সালের শারীরিক অসুস্থতার জের তখনও চলছে। ১৯৩৭ সালে বিষ্ণু দে-র মামাতো ভাইয়ের বাড়ি পুরীতে যাওয়া হয় সপরিবার। সে সময়ে চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, রথীন্দ্র মৈত্র ও সমর সেন-ও পুরী গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ-ও যান সপুত্রক। সকলে মিলে খুব আনন্দে কাটে। একদিকে রবীন্দ্রনারায়ণ, অন্যদিকে বন্ধুরা—ওঁদের সাহচর্যে শরীর এবং মনের বিশ্রাম হয়। অনেকে মিলে কোণারক-ভ্রমণেও যাওয়া হয় সেবারই।

১৮

বিষ্ণু দে বিয়ের পরই মধুপুরে Luna Villa-তে বেড়াতে আসেন—বাড়িটা

সুধীন্দ্রনাথের বর্তমান চিঠির ঠিকানা যে গ্রেনের খুব কাছাকাছি। সুধীন্দ্রনাথ সেটা জানতেন। তাই লিখেছেন, "এ জায়গার সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে।"

প্রথমা স্ত্রী-র সঙ্গে মনোমালিন্য দূর করার ব্যর্থ চেষ্টাতেই নাকি সুধীন্দ্রনাথের এই মধুপুর ভ্রমণ ও বাস। বিষ্ণু দে অবশ্য আমন্ত্রণ সত্ত্বেও এ যাত্রায় আর মধুপুর যান নি। তবে সুধীন্দ্রনাথ যে বিষ্ণু দে-কে উদ্বুদ্ধ করার জন্য "বাবুল"-সংক্রান্ত দুটি বাক্য লিখেছেন, তার পেছনে একটি গল্প আছে। বিষ্ণু দে চিঠিতে লিখেছেন, "একবার সুধীন্দ্রনাথ ছাবকে [প্রথমা স্ত্রী] নিয়ে মধুপুরে শ্বশুরবাড়িতে যান, সঙ্গে নেন সুমন্ত্র মহলানবীশকে। অধ্যাপক সুবোধ মহলানবীশের জ্যেষ্ঠপুত্রকে, প্রশান্তচন্দ্রের খুল্লতাতপুত্রকে। কেশবচন্দ্র সেনের দৌহিত্র, মহারানী সুচারু দেবীর বোন পো।" সঙ্গে প্রণতি দে যোগ করেছেন, "বাবুলকাকা (সুমন্ত্র মহলানবীশ) দারুণ রসিক লোক ছিলেন—উনি মজা করে বলেছিলেন যে দুই কবির মধ্যে পড়লে কুয়োতে ওকে ঝাঁপ দিয়ে ডুবতে হবে!"

১৯

১৯৪১ সালে প্রণতি দে—তখন তিনি কমলা গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা—খুব অসুস্থ ছিলেন। সেই অসুস্থতার বিষয়েই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দুটি চিঠিতে।

২০

সুধীন্দ্রনাথ কি এ-সময়ে 'পরিচয়' বেরোবার পর কবিতা পড়ছেন এবং পড়ে ভালো লাগছে? হিরণকুমার সান্যাল লিখেছেন, "যুদ্ধ বাঁধার কিছুদিন পরেই 'পরিচয়'-এর সম্পাদনায় সুধীনের সঙ্গে যুক্ত হলাম আমি। সুধীন তখন 'পরিচয়'-এর কাজ দেখবার আর বিশেষ অবসর পেত না। নীরেন রায়ও প্রায় সরে পড়েছিলেন।...প্রকাশক কুন্দভূষণ ভাদুড়ী তখন লেখা যোগাড় করতেন।"[১৫]

২১

"বাড়ি বয়ে পেট্রোল দিয়ে যাওয়া"-র "বদান্যতা"-র পেছনে একটা গল্প আছে। বিষ্ণু দে সংক্ষেপে লেখেন, "প্রণতির দাক্ষিণ্যে : স্কুলের সাহায্যে"। যুদ্ধের জন্য যখন পেট্রোলের উপর বিধিনিষেধ ছিল, তখন সুধীন্দ্রনাথের কিছু পেট্রোলের দরকার হয়ে পড়েছিল। কমলা গার্লস স্কুলের বোধহয় কিছু বাড়তি পেট্রোল

ছিল—তাই ওঁরা ট্যাক্সি করে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথের কাছে। সুধীনবাবু সেটা সম্পূর্ণ উপহার হিসেবে গ্রহণ করেন—দামটা ওঁরাই ঝুলে দিয়ে দেন। ফলে সুধীন্দ্রনাথ খুবই "কৃতজ্ঞ"!

"বার্টলি-দম্পতী"র কথাও উঠেছে—সুধীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বোধহয় একটু বাঁকাভাবে। ওঁদের সম্পর্কে বিষ্ণু দে প্রথমে লেখেন: "জেম্‌স্ বার্টলি অধ্যাপক হয়ে বোম্বাই থেকে প্রেসিডেন্সিতে আসেন, উত্তর আয়র্লণ্ডের মানুষ, পণ্ডিত, ল্যাটিনাদি ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল। এলসা তাঁর স্ত্রী।" জেম্‌স্ ও এলসা বার্টলি (Bartley)-র সঙ্গে বিষ্ণু দে-র পরিবারের কিছুটা অন্তরঙ্গতা হয়—বিশেষ করে জেম্‌সের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র। জেমস্ তখনই বাংলা শেখেন এবং বিষ্ণু দে-র "আকাশে উঠলো ওকি কাস্তে না চাঁদ" (দিনেশ দাসের কবিতা 'কাস্তে' অবলম্বনে সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে দুজনে দুটি কবিতা লেখেন মজা করে—তারই একটি) অনুবাদ করেন শিক্ষকদের সাহায্যে। দিল্লিতে 'Poems from the Forces' বইতে ছাপা হয়।

'পূর্বলেখ' (১৯৪১) সম্বন্ধে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর "প্রথম প্রতিক্রিয়া" নাকি বিষ্ণু দে-কে "ইতিপূর্বেই" জানিয়েছেন। কি জানিয়েছিলেন? যে "গোটা ছয়" কবিতা তাঁকে "অসম্ভব মাতিয়ে" তোলে সেগুলি কোন্ কোনটি? বিষ্ণু দে-র "সঠিক মনে নেই"—কিন্তু প্রণতি দে মনে করতে পারেন—"অনেকগুলি কবিতা পছন্দ হয়েছিলো—যেমন হম্‌ফ্রেকে dedicate করা 'পদধ্বনি', 'জন্মাষ্টমী' (সুধীনবাবুকে দেওয়া) বা 'বিভীষণের গান'...।"

২৩

সাম্যবাদী মহলে সাহিত্যিক মতান্ধতার বিরুদ্ধে বিষ্ণু দে প্রথমে পরিকল্পনা করেছিলেন 'লোকায়ত' প্রকাশ করার (স্নেহাংশু আচার্য, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি সঙ্গে ছিলেন)—কিন্তু সে পরিকল্পনা কাজে পরিণত হয় নি—পরে (১৯৪৮ সালে) যখন প্রকাশিত হয়, তখন তার নাম হয় 'সাহিত্যপত্র'। সুতরাং এ-দুটো তো সমান্তরাল পত্রিকা নয়। অতএব দুটিই "আশুপ্রকাশ্য" কেন? না কি অন্য কোনো পত্রিকার কথা?

২৪

AIR-এর তৎকালীন স্টেশন-ডিরেক্টর Zulfaquar Ali Bokhari ছোট

ভাই—বড় ভাই A. S. Bokhari, দিল্লিতে ডিরেক্টর জেনারেল। দুজনের সঙ্গেই বিষ্ণু দে-র বন্ধুত্ব, দুজনেই ওঁর উপদেশ ও সাহায্যের প্রার্থী। ছোট ভাইয়ের আমলে রেডিও-তে কোনো ব্যাপার নিয়ে স্ট্রাইক হয়—স্ট্রাইক মিটমাটের জন্য বোধহয় বোখা'র বিষ্ণু দে-র সাহায্য চান—সম্ভবত সেই স্ট্রাইকের বিষয়েই একটি রিপোর্ট লিখে স্টেটসম্যান হাউসে সুধীন্দ্রনাথকে দিয়ে আসতে যান বিষ্ণু দে।

২৮

এ চিঠিতে (এবং পরের চিঠিতেও) সুধীন্দ্রনাথের "দাঁতের যন্ত্রণা"-র কথা আছে। কারণ জানতে চাইলে বিষ্ণু দে মজা করে সংক্ষেপে লেখেন: "বয়স।" প্রণতি দে-র কাহিনীতেও কৌতুক কম নয়: "ওই সময়ে, বয়সের জন্যেই বোধহয়, সুধীনবাবু দাঁতের জন্য কষ্ট পেয়েছিলেন। শেষ কালে সব দাঁতই তুলে ফেলতে হয়। একদিন উনি এ সময়ে গিয়েছিলেন—তাতে সুধীন্দ্রনাথ মুখে হাত দিয়ে বলেন—Don't look at me—I am toothless! (আমি সেদিন যাইনি—উনি এসে হেসে আমায় বলেছিলেন)।"

'নবান্ন' নাটকের একজন সক্রিয় সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন বিষ্ণু দে—১৯৪৫ সালে 'ইণ্ডো-সোভিয়েট জর্নালে' একটি প্রবন্ধও লেখেন। ১৯৪৮-এও দেখা যাচ্ছে তিনি চেষ্টা করছেন অনিচ্ছুক বন্ধুকে নাটকটি দেখানোর, যদিও জানেন, তাঁর নিজেরই ভাষায়, "সুধীনবাবু তখন ঘোরতর বিরোধী এই সব কাজে।"

...লিণ্ডসে ও মিনি এমার্সন দুজনেই ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে-র বন্ধু।

"এই বন্ধু তখন 'স্টেট্‌সম্যান্' কাগজে যোগ দিয়েছেন, ব্রিস্টল হোটেলের মাথায় থাকেন, মতামতে কম্যুনিস্ট (যদিও প্রচ্ছন্ন) বলে আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, সুধীন্দ্রনাথের 'পরিচয়' আড্ডায় তার যাতায়াত, বিষ্ণু দে এবং আমার সঙ্গেও সে অন্তরঙ্গ...।...এর নাম লিন্‌সে এমার্সন, যে এখনো কলকাতায় (এবং 'স্টেটসম্যান' কাগজেই) রয়েছে, যে বিয়ে করেছিল আর. সি. বনার্জির বড়ো মেয়ে মিনিকে (মৃণালিনী), যে ছিল আমাদের বন্ধু, শীলা এবং অনীলাকে ('আইলীন') নিয়ে যারা ছিল তখনকার কলকাতার এক সুবিদিত ত্রয়ী। অসম্ভব ভালো এবং বুদ্ধিমান্ মানুষ হিসাবে লিন্‌সে আমাদের কাছে ছিল অত্যন্ত প্রিয়।...মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আবির্ভাবে আকৃষ্ট হয়ে আমাদের কাছ

থেকে দূরে সরে গেছে।…ক্রমশ সে কলকাতার ওপরতলার সামাজিক জীবন যাপন করেছে, মোটামুটি আমাদের সঙ্গ এবং আমাদের মত পরিত্যাগ করেছে। পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে সুধীনবাবুকেই তখন তার সবচেয়ে কাছের মানুষ বলা চলত।"[১৬]

লিণ্ডসে এমার্সনের সঙ্গে বিষ্ণু দে-র এক সময়ে খুবই বন্ধুত্ব ছিল। এমনকি লিণ্ডসেকে তিনি বাংলাও শেখাতেন—"ব্রিস্টল হোটেলে প্রতি বুধবার গিয়ে গিয়ে।" তখন লিণ্ডসে ছিলেন বামপন্থী ভাবাপন্ন, প্রায় কমিউনিস্ট। মৃণালিনী বা মিনি ছিলেন প্রণতি দে-র পূর্বপরিচিত বন্ধু। "Trunk-call proposal"[!]-এর পর উভয়ের বিয়ে হয়, যুদ্ধের সময় জাপানীদের হাতে বন্দী হন লিণ্ডসে, মিনির দীর্ঘ প্রতীক্ষা: উভয়ের জীবনের উত্থানপতনের সঙ্গে মানসিকভাবে জড়িত ছিলেন ওঁরা। কিন্তু যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে, এঁদের মনে হয়, "কি রকম বদলে গেলো লিণ্ডসে"।

৩৩

স্ত্রীর শারীরিক অসুস্থতা সারাবার জন্যই বিষ্ণু দে প্রথম সাঁওতাল পরগণার একটি নির্জন গ্রাম রিখিয়ায় যান ১৯৪৫ সালে—'ক্যালকাটা গ্রুপে'র শিল্পী নীরদ মজুমদারের প্ররোচনায়। তার পর থেকে অসংখ্যবার তিনি এখানে এসে দীর্ঘ সময় কাটান। তাঁর বর্তমান নিবাস রিখিয়াতেই। রিখিয়ার প্রকৃতির একটি স্থায়ী ভূমিকা রয়ে যায় তাঁর জীবনে এবং কবিতায়।

৩৮

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সুধীন্দ্রনাথের যে গ্রন্থ-সংগ্রহ আছে, তাতে সুধীন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'-এর ১ম সংস্করণটি আছে। তাতে পাতায় পাতায় পাওয়া যাবে সুধীন্দ্রনাথের নিবিড় ও মনোযোগী পাঠের চিহ্ন। শব্দের পাশে, তলায় বা মার্জিনে অজস্র অনুমোদনসূচক (✓), প্রশ্নবোধক (?) বা অধোরেখ (—) চিহ্ন আছে, হালকা পেনসিলের সাহায্যে। ওগুলো যে সুধীন্দ্রনাথেরই করা, তার একটা বড় প্রমাণ বর্তমান চিঠিটি—অর্থাৎ গ্রন্থে চিহ্নিত অংশগুলিই চিঠিতে প্রধানত উল্লিখিত বা সমালোচিত।

সুধীন্দ্রনাথের এই দীর্ঘ পত্রাকার সমালোচনাটি সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র মতামত

জানতে চাইলে তিনি আজ শুধু এটুকুই বলেন: " 'অধিক কি আর লিখিব?' ফারাক্ তখন গভীর।"

বলা বাহুল্য এই "ফারাক্" মূলত নান্দনিক। এবং সেই কারণেই বিষ্ণু দে-র "বিস্ময়কর" "সৃজনীশক্তি"র অকুণ্ঠ প্রশংসা করেও, সবিস্তারে আপত্তির কথাও জানান উনি। এই আপত্তির কোনো কোনোটি এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধেই আলোচিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও সুধীন্দ্রনাথের সমালোচিত আরো দুটি প্রসঙ্গ এখানে বিচার করা যায়।

সুধীন্দ্রনাথ ৫ম অনুচ্ছেদে বিষ্ণু দে-র কোনো কোনো কবিতার—ওঁর ভাষায় "বহুলাঙ্গ" কবিতার—কাঠামো সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ, কবিতাগুলি "খণ্ড খণ্ড ভাবে উপভোগ্য"—কিন্তু সব মিলিয়ে "অবয়বসমূহের সংযোগ" স্পষ্ট নয়। বিষ্ণু দে-র দীর্ঘ কবিতা সম্পর্কে এ অভিযোগ শুধু যে সুধীন্দ্রনাথই করেছেন তা নয়। এই অভিযোগের খণ্ডনে আমার একটি ছোট প্রবন্ধে যে যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল, এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা যায়।[১৭] দীর্ঘ কবিতার যে কাঠামোটি সর্বগ্রাহ্য তা হচ্ছে সিমফনিক সংগীতের তুলনীয়-ভাবে খণ্ড বা অংশগুলির সংসক্তি, নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের অনিবার্যতায়। কিন্তু, বিষ্ণু দে, আমার মতে, এক ধরনের দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন—বোধহয় 'অন্বিষ্ট' থেকেই—যাতে খণ্ডগুলি, ভারতীয় রাগসংগীতের মতোই, কয়েকটি স্বর বা অনুষঙ্গের দ্বারা বিধৃত। আগের ধারণায় একে "পৌর্বাপর্য বিরহিত" বা "অনৈক্য" বলে মনে হতে পারে—কিন্তু আসলে এ এক নতুন ধরনের ঐক্যবোধের দ্বারা চালিত। 'অক্টোবর দিনগুলি' তো এভাবেও পড়া যায়।

ঠিক তেমনি 'কালের রাখাল শিশু: ২১ শে ডিসেম্বর' কবিতায় "বনস্পতি উপমা আর দিউগাশভিলি উপমান" এই বলে সুধীন্দ্রনাথ যে আপত্তি করেন এবং পরবর্তী চিঠিতে "বনস্পতিতে দিউগাশভিলি···সত্য সত্যই উপমেয়" বিষ্ণু দে-র এই উত্তর সত্ত্বেও মনে করেন একে "উপমা-উপমানের স্থানবিপর্যয়" বা "প্যাথেটিক ফ্যালাসি"-র উদাহরণ—তা সত্যিই বিস্ময়কর।—আমাদের পাঠের অভিজ্ঞতায় তা মেলে না। সমস্ত কবিতাটিতে, বস্তুত প্রথম চরণ থেকেই "প্রত্যহের বিকাশে"র দুটি সমান্তরাল ছবি হাজির হয়—একদিকে কালের রাখাল, বংশীবাদনরত কৃষ্ণ, যিনি অভ্রান্ত ছন্দে ও নিরাসক্ত আকাঙ্ক্ষায়

ত্রিকালকে মেলান এবং অন্যদিকে সরস সতেজ কচি শাল বা পিয়াল, জ্বালানি তক্তার ব্যর্থতায় নয়, বনস্পতির সম্পূর্ণতায় যা পৌঁছয়। আমরা কিন্তু বুঝি এগুলো উপমা মাত্র, বর্ণনার বিস্তারে প্রায় প্রতীকোপম, অন্তরালে আছে সামাজিক-রাজনৈতিক রূপান্তরের ও সার্থকতার স্বপ্ন। ফলে কবিতার একেবারে শেষে "দিউগাশভিলির মতো" (দিউগাশভিলি স্টালিনের নাম) শব্দ দুটি চকিতে সেই জগতকে স্পষ্ট করে তোলে। দৃশ্যত উপমান, কিন্তু স্টালিনের নামের সঙ্গে জড়িত সামাজিক রূপান্তরের স্বপ্নই যে কবিতার উপজীব্য তা আর আমাদের কাছে ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না—আমাদের প্রস্তুতি আগে থেকেই ছিল কবিতায়।

এর আরো একটা ভালো উদাহরণ পরবর্তীকালে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' গ্রন্থের 'সার্কাসের বাঘ'—যেখানে শিকারীর দীর্ঘবর্ণিত প্রতীক্ষা অকস্মাৎ উপমিত হয় উনিশ শ সতেরোর অক্টোবরে লেনিন-স্টালিনের প্রতীক্ষার সঙ্গে—ফলে "বড়তেই...ছোটর উপমা" এখানেও পেয়ে যায় অন্য মাত্রা। বিশ্বাসরিক্ত অনীহাতেই কি সুধীন্দ্রনাথ বুঝতে অনিচ্ছুক কোন্ আত্মসচেতনতায় প্রকরণে এই আকস্মিকতার বিস্ময়?

৪১

অর্কেস্ট্রা'র ১ম সংস্করণের পর ২য় সংস্করণে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন সুধীন্দ্রনাথ—কখনো শব্দের, কখনো চরণের, কখনো বা সম্পূর্ণ স্তবকের। এই পরিবর্তন, পরিমার্জন বা সংস্কারসাধনের সপক্ষে তাঁর সুস্পষ্ট একটি মত ছিল। বিষ্ণু দে দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠে "উত্তেজিত", কারণ তিনি বরাবরই সুধীন্দ্রনাথের এই নিরন্তর রচনা সংশোধন বা পরিমার্জনার আদর্শকে শ্রদ্ধা করেন।

"ধূর্জটির মুখে যে খবর রটে তার যাথার্থ্য মেনে নিলে বিপদে পড়বেন"—লিখেছেন সুধীন্দ্রনাথ। বোধহয় ধূর্জটিপ্রসাদের অতিরিক্ত এবং হয়তো কিছুটা "লম্বা-চওড়া" কথা বলার অভ্যাস বন্ধুদের মধ্যে সুবিদিত ছিল—অন্তত কেউ কেউ সে-কথাই বলেছেন। এই অভ্যাস কখনো কখনো মৈত্রীতে আবদ্ধ বন্ধুদের মধ্যে মনান্তর সৃষ্টিতে আরো ইন্ধন জোগাতে তো পারেই! সুধীন্দ্রনাথের চিঠিতে অবশ্য কথাটা হালকাভাবেই বলা হয়েছে।

৪২

১৯৫৪-তে স্পেণ্ডর বোধহয় আসেন নি কলকাতায় বা ভারতবর্ষে। ১৯৫২-তে তিনি কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডমের আমন্ত্রণে প্রথম ভারতবর্ষে আসেন—কিন্তু কলকাতায় নয়। কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে বোম্বাইতে দেখা হওয়ার কথা বলেছেন। দ্বিতীয় বার আসেন ১৯৬০-এ, এবার কলকাতায়ও, একই সংস্থার আমন্ত্রণে। প্রণতি দে-র স্মৃতিচারণায় জানা যায়: "স্পেণ্ডরকে সুধীনবাবু ওঁর রাসেল স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে ডাকেন, অন্য কবিদেরও ডাকেন। আমিও গেছিলুম ওঁর সঙ্গে—বেশ স্পষ্ট মনে আছে সেই সন্ধ্যাটা।"

৪৩

"হম্‌ফ্রি হাউস [Humphrey House—সুধীন্দ্রনাথ লেখেন হাম্‌ফ্রি হাউস] কেম্‌ব্রিজে সাহিত্য গবেষণায় খ্যাতি নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজী অধ্যাপক হয়ে এলেন ১৯৩৬ সালে—আগেকার বিদেশী অধ্যাপক থেকে একেবারে আলাদা ধরনের মানুষ, সাহেব পাড়ায় না থেকে উঠলেন সস্ত্রীক, সেণ্ট পল্‌স্ কলেজের হোস্টেলে···।··· 'পরিচয়'-এর আড্ডায় সে যেতে থাকে, পরম বন্ধু হয়ে ওঠে সুধীনবাবুর; এক সঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের কাছে যাই।··· বলা বাহুল্য, সরকারী চাকুরি আঁকড়ে সে থাকতে পারেনি এবং সেজন্যই নামমাত্র বেতনে কাজ করতে থাকে রিপন কলেজে।"···"এমনই ছিল হম্‌ফ্রি—পরে সে···Hopkins সম্বন্ধে প্রাথমিক গ্রন্থ দেশে ফিরে লিখেছে, Dickens-বিষয়ে বিলাতে প্রধান পণ্ডিত বলে গণ্য হয়ে, হঠাৎ মারা গেছে—সুধীনবাবু তার বিশেষ বন্ধু হয়েছিলেন, বিষ্ণুবাবুও, সন্দেহ নেই যে আমরা তাকে কখনো ভুলব না।"[১৮]

হম্‌ফ্রি হাউস খুব বন্ধুবৎসল লোক ছিলেন—পরিশ্রমী পণ্ডিত, সৎ অথচ কৌতুকপ্রবণ মানুষ। সকলেরই তিনি খুব প্রিয় ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথের কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িতেও তিনি থেকেছিলেন কিছুকাল—সুধীন্দ্রনাথের প্রথমা স্ত্রী ছবির কাছে হম্‌ফ্রি বাংলা শিখেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে তো বটেই, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বিষ্ণু দে-র সঙ্গেও হম্‌ফ্রি হাউসের নিবিড় বন্ধুত্ব হয়। বিষ্ণু দে ও হম্‌ফ্রির মধ্যে পত্রবিনিময়ও ঘটত।

৪৪

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়—কবি, 'সাহিত্যপত্রে'র প্রথম সম্পাদক, দান্তে-বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি প্যারিসে গিয়েছিলেন ওখানকার জাতীয় গ্রন্থাগারে সম্ভবত কাজ শিখতে এবং করতে। ওখানেই সাক্ষাৎ হয় তাঁর সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের। ঐ সাক্ষাৎকারের সময় এবং উপলক্ষ বিষয়ে চঞ্চলবাবু-র কাছে জানতে চাইলে উনি লিখে পাঠান: "সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ ১৯৫৫। উনি প্রথমে লণ্ডন থেকে চিঠি লেখেন কবে প্যারিসে আসবেন। কোথায় থাকবেন ইঃ। ওঁর স্ত্রীও ছিলেন। একদিন বিখ্যাত ছাত্রাবাসে (Cite) কবিতা পাঠ করেন। প্রথমে বাংলা, পরে ইংরেজি অনুবাদ। পাঠান্তে Vin rouge।..."১৯

৪৬

'স্বগত' গ্রন্থের ২য় সংস্করণে সত্যিই অনেক "ঘষা-মাজা" হয়েছে: রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ২টি প্রবন্ধ এবং ৩খানা বইয়ের সমালোচনা বাদ গেছে (ঐ একই সময়ে প্রকাশিত 'কুলায় ও কালপুরুষ' প্রবন্ধগ্রন্থে স্থান পেয়েছে) এবং "তৎপরিবর্তে অলড্‌াস্ হাক্সলি ও ওমানির প্রসঙ্গে একটি নিবন্ধ" যুক্ত হয়েছে। ফলে নতুন সংস্করণে গ্রন্থটির মূল উপজীব্য দাঁড়িয়েছে "বিদেশী সাহিত্য"। তা ছাড়া ভাষাগত পরিবর্তনও তিনি ঘটিয়েছেন বিভিন্ন সংস্করণে।

৪৯

"সম্বর্ধনা পুস্তক"-এর জন্যই "চোরাবালি-সম্পর্কিত" সুধীন্দ্রনাথের বহু পরিচিত প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রণের পরিকল্পনা হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে তথ্য ৪৭নং চিঠির টীকায় দেওয়া হয়েছে। 'চোরাবালি' গ্রন্থের "মুখবন্ধ", 'স্বগত'-র ১ম সংস্করণের প্রবন্ধ এবং 'কুলায় ও কালপুরুষ'-এর প্রবন্ধ—এই তিনটি পাঠের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন আছে—তবে খুবই গৌণ পরিবর্তন—শব্দপরিবর্তন, ছেদচিহ্নের পরিবর্তন এবং সর্বোপরি অনুচ্ছেদের পুনর্বিন্যাস—বক্তব্য মূলত একই আছে। তবে তুলনায় 'কুলায় ও কালপুরুষে'র প্রবন্ধের পাঠপরিবর্তনের পরিমাণ বেশি। তাই ঐ পাঠই সুধীন্দ্রনাথের কাছে "বর্তমানে গ্রাহ্য"। তবে চিঠিটি পড়ে বোঝা যায়, আগে "সংশোধনের" ইচ্ছা তাঁর ছিল—সংশোধিত হলে সেটি হত চতুর্থ পাঠ।

৫০

বলা মুস্কিল এই চিঠিতে কোন্ কবিতার কথা বলেছেন সুধীন্দ্রনাথ। 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ', 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' এবং 'সেই অন্ধকার চাই'—তিনটি গ্রন্থেই ১৯৫৯-এর কবিতা আছে—তারই কোনো একটি কবিতা নিশ্চয়ই।